১০ই নভেম্বর স্মরণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

স্মরণ সভা
তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২২
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি

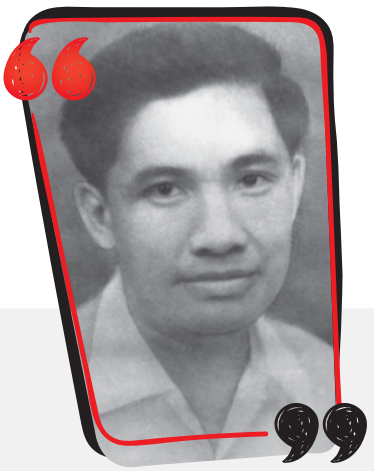

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০২৩

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	০৪
প্রবন্ধ	০৬-৩৫
রক্তস্নাত ১০ই নভেম্বর: আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ – সজীব চাকমা	০৬
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংগ্রাম এখনও শেষ হয়ে যায়নি – জিকো চাকমা	১৫
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সংগ্রামও ন্যায়সঙ্গত – অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল	১৮
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার 'ভবঘুরে' জিজ্ঞাসা – পাভেল পার্থ	২১
এম এন লারমার গণ জিজ্ঞাসা ও সর্বাঙ্গ সুন্দর দেশের ভাবনা: কেন এখনও প্রাসঙ্গিক- সতেজ চাকমা	২৪
ফিলিস্তানীদের জন্য যখন কাঁদবেন, পাশের বাড়ির পাহাড়িদের জন্যও একটু কাঁদবেন – ইমতিয়াজ মাহমুদ	২৮
১০ই নভেম্বর: মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণা যোগাবে – বাচ্চু চাকমা	২৯
১০ই নভেম্বর ও আজকের পার্বত্য পরিস্থিতি – শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা	৩১
পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক – উষাতন তালুকদার	৩৩
কবিতা	৩৬-৪১
এম এন লারমা – হ্লানুসাং মারমা	৩৬
তুমি আসবে বলে – সত্যবীর দেওয়ান	৩৬
তার নাম শৈল চট্টল –উ উইন মং জলি	৩৭
তরুণ প্রজন্ম – জড়িতা চাকমা	৩৮
মুক্তি – অমর সুজন চাকমা	৩৮
ছুটে চলা পাহাড়ের আর্তনাদ শুনতে – ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা	৩৯
হবে একদিন, হবে যে অবশ্যই-ই! – কুর্নিকোভা চাকমা	৪০
বিশেষ প্রতিবেদন	৪২-৪৮
জেএসএসের জাতীয় সম্মেলন সম্পন্ন: বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করাসহ ১৮দফা প্রস্তাবাবলী গৃহীত	৪২
আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বর্তমান অবস্থা	৪৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৮ম সভা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	৪৫
সংবাদ প্রবাহ	৪৯-৬৮
প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন	৪৯
সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা	৫৮
সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল	৬১
যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা	৬৪
সংগঠন সংবাদ	৬৯-৮৩
আন্তর্জাতিক সংবাদ	৮৪-৮৭

সম্পাদকীয়

আজ শোকাবহ ১০ই নভেম্বর। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরনের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক সাংসদ, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে ১৯৮৩ সালে 'গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ' চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে আটজন সহযোদ্ধাসহ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শাহাদাৎ বরণ করেন। মহান বিপ্লবী এম এন লারমার এই মহাপ্রয়াণে জুম্ম জাতি হয়েছিল হতবিহ্বল, শোকে কাতর। সেই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জুম্ম জাতি সেই বিভেদপন্থী জাতীয় কুলাঙ্গার চার কুচক্রী ও তাদের দোসরদের উপর উপর্যুপরি আঘাত হেনে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল। জুম্ম জাতি প্রমাণ করেছে মহান নেতাকে শারীরিকভাবে হত্যা করা হলেও হত্যা করা সম্ভব হয়নি তাঁর আদর্শ ও চেতনাকে।

এই জাতীয় শোকাবহ দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মহান নেতা এম এন লারমার অসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। এছাড়া প্রতিনিয়ত কঠিন প্রতিকুলতার মুখে আন্দোলন করতে গিয়ে পার্টির বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও বীরযোদ্ধা নিজেদের অমূল্য জীবন দান করে গেছেন, তাদের অসামান্য আত্মবলিদানের প্রতি জানাচ্ছে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে পার্টির অনেক কর্মী ও সংগ্রামী ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন কারাগারে অন্তরীণ হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে পঙ্গুত্ব জীবন বরণ করেছেন, তাঁদের এই অমূল্য ত্যাগ ও অবদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছে এবং সকল শহীদ, বন্দী, পঙ্গু কর্মী ও ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে।

এম এন লারমার গড়ে তোলা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ফসল হিসেবে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ ২৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। বর্তমানে আওয়ামীলীগ সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইনসার্জেন্সির অবসান হলেও শেখ হাসিনা সরকার ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন জারি করে সেনাবাহিনীর হাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তুলে দিয়েছিল। উক্ত 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার ব্যবস্থা, উন্নয়নসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

সেনাবাহিনী তথা সরকার জনসংহতি জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার ব্যক্তি ও সংগঠনকে ক্রিমিনালাইজ (অপরাধীকরণ) করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ',

'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক সাজানো মামলা দায়ের করা, তাদের ঘরবাড়ি তল্লাশি ও জিনিসপত্র তছনছ করা, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার করা, ক্রসফায়ারের নামে গুলি করে হত্যা করা, ক্যাম্পে নিয়ে মারধর করা ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

সরকার কেবল চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসেনি, সেই সাথে পার্বত্য চুক্তিকে পদদলিত করে সেনাবাহিনী তথা সরকার একের পর এক চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্র হাতে নিতে থাকে এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্র কাজে লাগিয়ে চারিদিকে ঘিরে ধরার মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের নীলনক্সা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একদিকে জুম্ম জনগণের মধ্য থেকে সুবিধাবাদী, ক্ষমতালিপ্সু, উচ্ছৃঙ্খল ও তাবেদার ব্যক্তিদের নিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করে সেসব গোষ্ঠীকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তথা জনসংহতি সমিতিসহ চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে চলেছে, অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ নামে একক সংগঠনে বাঙালি মুসলিম সেটেলারদের সংগঠিত করে এবং মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীদের উস্কে দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী তথা সরকারের এই প্রক্সি যুদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে সাময়িক ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে বটে, তবে চূড়ান্তভাবে এই প্রক্সি যুদ্ধ সেনাবাহিনী তথা সরকারের জন্য বুমেরাং হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে বমপার্টি সেনাবাহিনী তথা সরকারের জন্য বুমেরাং ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। তাই সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে ও জাতীয় উদ্যোগে সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। একটা রাজনৈতিক সমস্যা কখনোই সামরিক উপায়ে প্রক্সি যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধান হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে প্রক্সি যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধানের নীতি পরিহার করে পার্বত্য চুক্তির যথাযথ, পূর্ণাঙ্গ ও দ্রুত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে সেনাবাহিনী তথা সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিঃসন্দেহে শুভ ফল বয়ে আনবে তা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

প্র ব ন্ধ

রক্তস্নাত ১০ই নভেম্বর: আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ

সজীব চাকমা

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে শোকাবহ, সবচেয়ে কলঙ্কজনক ও সবচেয়ে হতাশা উদ্রেককারী একটি দিন। বোধ হয় জুম্ম জাতির স্মরণকালের ইতিহাসে কাপ্তাই বাঁধ মরণ ফাঁদের ন্যায় এই দিনটিও জুম্ম জাতির জন্য অত্যন্ত বিপর্যয়কর ধ্বংসাত্মক একটি ঘটনাও বটে। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে বিজাতীয় ও পাকিস্তানী ইসলামি সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল জুম্ম জাতিগোষ্ঠীসমূহকে ধ্বংসের কিনারে নিয়ে যেতে; অপরদিকে কাপ্তাই বাঁধের বিপর্যয়ের পর, জুম্ম জাতিকে রক্ষা, ঘুমন্ত জুম্ম জাতির জাগরণ, তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ, তাদের ঐক্যবদ্ধকরণ এবং অধিকারের জন্য আন্দোলনে সংগঠিত করতে যে নেতা অন্ধকারের আলোকবর্তিকা হয়ে তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র এইদিন তাঁকেই এবং তাঁকেসহ আরও আট সহযোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনকে চিরতরে ধ্বংস করার প্রয়াস চালিয়েছিল। নিশ্চয়ই এই আত্মবিধ্বংসী অপকর্ম না হলে জুম্ম জাতির অবস্থা ও জুম্ম জাতির আন্দোলনের ইতিহাস অন্যভাবে আরো উজ্জ্বলভাবে রচিত হতে পারত। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে হয়ত নতুন সূর্যোদয় হত।

দশই নভেম্বর হচ্ছে ক্ষমতালোভী, উচ্চাভিলাষী, বিভেদপন্থী ও বিশ্বাসঘাতক চক্রের ষড়যন্ত্রের ফসল। এই ঘটনা না ঘটলে বা এই ষড়যন্ত্র না হলে জুম্ম জাতির ইতিহাস আজ এত রক্তাক্ত এত বন্ধুর হতো না। পার্টি ও শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র কার্যক্রম শুরুর মাত্র ৬/৭ বছরের মাথায় তথা দশই নভেম্বরের ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত পার্টি হয়ে উঠেছিল একপ্রকার অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য। কেবল বর্তমান নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পর একটু থমকে দাঁড়ালেও আন্দোলন বিকাশে পার্টির নেতাকর্মী ও জনগণের মধ্যে ছিল অটুট মনোবল, অসীম সাহস ও প্রবল আত্মবিশ্বাস। কিন্তু দশই নভেম্বরের হামলার ঘটনা ছিল যেমন চরম বিশ্বাসঘাতকতা তেমনি ছিল চূড়ান্ত হঠকারী ও জাতিবিধ্বংসী কর্মকান্ড। এই ঘটনা জুম্ম জাতির অনিবার্য প্রগতিকে গভীরভাবে সংকটাপন্ন করে। বিভেদপন্থীরা সেদিন কেবল জুম্ম জাতির চোখের মনি, জুম্ম সমাজের প্রগতিশীল স্বপ্নদ্রষ্টা, মহান নেতার জীবনকে হারিয়ে দেয়নি, তখন তাঁর নেতৃত্বে জুম্ম জাতির মধ্যে যে জাগরণের জোয়ার, যে অভূতপূর্ব একতা-সংহতি, যে অদম্য সংগ্রামী স্পৃহা ও আত্মত্যাগের মহিমা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রেও গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। গোটা জাতিতে যুগপৎ হতাশা ও ক্ষোভ সঞ্চার করে।

জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের ইতিহাসকে জানতে হলে, সেই আন্দোলনের প্রকৃত নেতা-নেতৃত্বকে বুঝতে হলে, সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হলে, বিভেদপন্থীদের ভুল চিন্তাধারাকে চিনতে হলে, পার্টি-আন্দোলন-সমাজ থেকে সেই ক্ষতিকর চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডকে দূরীভূত করতে হলে, ভবিষ্যতের ভুলকে এড়িয়ে যেতে হলে আমাদের অবশ্যই রক্তাক্ত দশই নভেম্বরের পাঠ নিতে হবে। আমরা দেখেছি, দশই নভেম্বরের পরবর্তীতেও যারা এই ইতিহাসের পাঠ নেয়নি বা এই ইতিহাসের শিক্ষাকে ভুলে গেছেন বা অগ্রাহ্য করেছেন তারা বারবার সেই ভ্রান্তপথের শিকার হয়েছেন, জুম্ম জাতির অধিকারের আন্দোলনকে ও জুম্ম জনগণকে বিপদগ্রস্ত করেছেন, নিজেরাও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের দিকেই অগস্ত্যযাত্রা করেছেন।

আন্দোলনে নেতৃত্বের প্রশ্ন

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণ যখন যুগ যুগ ধরে সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক ও উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল, একের পর এক বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠীর নির্মম ও বর্বরোচিত দমন-পীড়নে জর্জরিত হয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যখন চরম অবলুপ্তির পথে ধাবিত হচ্ছিল, ঠিক তখনি মুক্তির অগ্নিমন্ত্র নিয়ে জুম্ম জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হন অসাধারণ প্রতিভাধর মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি দ্রুত অবলুপ্তির অভিমুখে ধাবমান জুম্ম জাতিকে প্রগতিশীল জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগরিত করে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁরই নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের প্রথম ও একমাত্র লড়াকু রাজনৈতিক পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে সূচিত হয় জুম্ম জাতির দুর্বার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন।

যেকোনো আন্দোলনে নেতা ও নেতৃত্বের প্রশ্নটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নেতা ও নেতৃত্বই জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং তাদের নেতৃত্বে কর্মীবাহিনী আন্দোলনকে পরিচালনা করেন। নেতা ও নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে একটি পার্টির সঠিক আদর্শ, সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, রণনীতি ও রণকৌশল, যথাযথ কর্মীনীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আন্দোলনের এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ যথাযথভাবে নির্ধারণ করা গেলে এবং তার আলোকে নেতা ও নেতৃত্ব, কর্মীবাহিনী, পার্টি ও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে, সাহসের সাথে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে সেই আন্দোলন অবশ্যই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে। এম এন লারমা হলেন এমন একজন নেতা, চিন্তাবিদ, বিপ্লবী রাজনীতিবিদ যিনি আন্দোলনের এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মীমাংসা করেই জুম্ম জনগণের আত্মপরিচয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্ম দেন।

> জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের ইতিহাসকে জানতে হলে, সেই আন্দোলনের প্রকৃত নেতা-নেতৃত্বকে বুঝতে হলে, সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হলে, বিভেদপন্থীদের ভুল চিন্তাধারাকে চিনতে হলে, পার্টি-আন্দোলন-সমাজ থেকে সেই ক্ষতিকর চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডকে দূরীভূত করতে হলে, ভবিষ্যতের ভুলকে এড়িয়ে যেতে হলে আমাদের অবশ্যই রক্তাক্ত দশই নভেম্বরের পাঠ নিতে হবে। আমরা দেখেছি, দশই নভেম্বরের পরবর্তীতেও যারা এই ইতিহাসের পাঠ নেয়নি বা এই ইতিহাসের শিক্ষাকে ভুলে গেছেন বা অগ্রাহ্য করেছেন তারা বারবার সেই ভ্রান্তপথের শিকার হয়েছেন, জুম্ম জাতির অধিকারের আন্দোলনকে ও জুম্ম জনগণকে বিপদগ্রস্ত করেছেন, নিজেরাও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের দিকেই অগস্ত্যযাত্রা করেছেন।

সবক্ষেত্রেই এম এন লারমা একজন দূরদর্শী, নিঃস্বার্থ, মানবতাবাদী, আদর্শবান, ন্যায়পরায়ণ, পথপ্রদর্শক, সাহসী ও বিপ্লবী নেতার পরিচয় দেন। ছাত্রজীবন থেকে পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে একজন জনদরদী জনপ্রতিনিধি, আইন প্রণেতা ও জাতীয় নেতা হিসেবে, জুম্ম জনগণের একজন প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের সাথে আলোচনায়, জুম্ম জনগণের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি', সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী, প্রথম নারী সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি', পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, গ্রাম সংগঠন 'গ্রাম পঞ্চায়েত' ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হিসেবে তাঁর যোগ্যতা, দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দেন। পঞ্চাশ, ষাট দশকেও যে জুম্ম জাতিসমূহ ছিল একে অপর থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, একে অপরের প্রতি উদাসীন, জাতীয় অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সর্বোপরি প্রায় সকল জাতিসমূহই ছিল নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত, সেই জুম্ম জাতিসমূহকেই তিনি ঐক্যবদ্ধ ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন।

তাঁর নেতৃত্বেই দূরদর্শিতার সাথে পার্টি 'মানবতা'কে তার আদর্শ এবং 'জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সম-অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার'কে পার্টির মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। জুম্ম সমাজের ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও বিশ্ব সমাজের প্রগতির ইতিহাসকে বিচার-বিশ্লেষণ করে পার্টি তার যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে। পার্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি হল– ১। (ক) বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। (খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিসমূহের মধ্যেকার ভেদাভেদ, নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনা দূরীকরণ। ২। (ক) জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা। (খ) জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা। ৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার বিকাশ সাধন। ৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের অগণতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের অবসান করা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, মৌলবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরোধীতা ও প্রতিরোধ করা। ৫। সমাজের নারীর সম-অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নারী মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করা।

বস্তুত জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণ, জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব, স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের জন্ম ও এর বিকাশ এম এন লারমার নেতৃত্ব ও ভূমিকাকে বাদ দিয়ে কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু চক্রান্তকারী ও কূপমন্ডুক বিভেদপন্থীরা সেই নেতাকেই এবং তার সাথে সম্ভাবনাময় ও উজ্জ্বল কয়েকজন সহযোদ্ধাকে ও হত্যা করে। হামলাকারীরা সেদিন কেবল মহান নেতাকে হত্যা করেনি, নির্ভরযোগ্য সংগ্রামী সদস্য সন্তু লারমাসহ আরও

অনেক নির্ভরযোগ্য নেতাকর্মীকে হত্যার চেষ্টা করে।

বিভেদপন্থীদের উত্থান এবং ষড়যন্ত্র

জুম্ম জাতিকে জাগরণে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলন গড়ে তোলার গোড়ার দিকে যাদের কোনো ভূমিকাই ছিল না, এমনকি পরবর্তীতেও যাদের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো অবদান ছিলো না, বিভেদপন্থী হিসেবে পরিচিত সেই চার কুচক্রী পার্টি গঠনের কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই পার্টির অভ্যন্তরে নানাভাবে বিশৃঙ্খলা, পার্টির সুযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নীতি ও পদ্ধতি বহির্ভূত সমালোচনা, নানা কুতর্ক শুরু করে। বস্তুত এম এন লারমার নেতৃত্বে, দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে পার্টি যখন উঠে দাঁড়িয়েছে, তার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে, ঠিক তখনি তারা নানা কথা বলে, হম্বিতম্বি করে নিজেদের যোগ্যতর হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে পার্টির অন্যতম নেতৃস্থানীয় সদস্য বলেন, '১০ই নভেম্বরের বহু আগে থেকেই তারা তাদের ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের কথাগুলোতে তেমন কোনো ভিত্তি না থাকলেও তারা অনেকটা গায়ের জোরেই যা নয় তাই বলে প্রচার করতেন মূলত বর্তমান পার্টি সভাপতি ১৯৭৬ সালে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর যে কয়েক বছর জেলে ছিলেন, এর মধ্যেই তারা পার্টির নেতৃত্ব দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। কার্যত বর্তমান নেতা গ্রেপ্তারের ফলে পার্টির প্রগতিশীল অংশটি দুর্বল হয়ে পড়ে আর একটি অংশ ছিলো মধ্যপন্থী। তাদের মধ্যে উচ্চাভিলাষ, অহংবোধ দেখা দিয়েছিল। অহংবোধের পাশাপাশি, তাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রীতি কুমার তো রাখঢাক ছাড়াই বলতে থাকে যে, এই দুই ভাই (এম এন লারমা ও সন্তু লারমা) দিয়ে কিছুই হবে না। তাদের উদ্দেশ্য হলো পার্টি থেকে দুই ভাইকে মাইনাস করা।' তিনি আরও বলেন, 'বর্তমান নেতা জেলে থাকার সময় বিভেদপন্থীরা কর্মী ও জনগণকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। একসময় তারা নানাভাবে পার্টির নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তকে অমান্য করতে থাকে। পলাশ নেতৃত্বের নির্দেশ মানছে না, ভবতোষ দেওয়ান সহযোগিতা করছে না, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েও দেবেন যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করছে। অথচ পশ্চাতে বিভ্রান্তিমূলক নানা কথা বলতে থাকে, এটা কেন এমন হলো, ওটা তেমন হলো না কেন ইত্যাদি নানা কথাবার্তা।'

মহান নেতা এম এন লারমার প্রদর্শিত পথে জনসংহতি সমিতি সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে যে, নীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া ও কৌশলগতভাবে জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সাহায্য চাওয়া ও বন্ধু গড়ে তোলা; এবং নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করা ও কৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা। কিন্তু পার্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুবিধাবাদী, ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী, দুর্নীতিবাজ ও দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের তাবেদার ভবতোষ দেওয়ান (গিরি), প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ), দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন) ও ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) চক্র জনসংহতি সমিতির এই আদর্শ ও নীতি-কৌশলকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তাদের হীন মুখোশ পার্টির মধ্যে বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি। জনসংহতি সমিতির ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সম্মেলনে সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানীদের সেই মুখোশ উন্মোচিত হয়। জাতীয় সম্মেলনে প্রকাশ-দেবেন চক্র অবৈধভাবে নেতৃত্বের ভাগীদার হওয়ার উচ্চাভিলাষ গোপন রাখতে পারেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে '৭৬ সালে রেইংখ্যং অভিযানে ভবতোষ দেওয়ান (গিরি)-এর চরম ব্যর্থতা, '৭৭ সালে চাবাই মগ (মংহ্লাউ)-এর এমএনএফ অভিযানের ব্যর্থতা, '৭৯ সালে ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ)-এর বগাপাড়া অপারেশনে শোচনীয় ব্যর্থতা, '৮১ সালে দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন)-এর 'টি' জোন অভিযানের বিফলতা আর প্রীতিকুমার চাকমা (প্রকাশ)-এর উদ্দেশ্যমূলক মুরুব্বিয়ানাসহ তাদের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপদলীয় চক্রান্তের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পাঁয়তারা শুরু করে।

১৯৮০ সালের ২২ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সামরিক শাখার ফিল্ড কমান্ডার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বন্দী অবস্থা থেকে বিনাশর্তে মুক্তি লাভ করার পর দলীয় কাজে যোগ দেন। এতে সমস্ত পার্টির মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হতে শুরু করে, যার ফলে নতুন কর্মশক্তিতে পার্টি আরো গতিময় ও সচল হয়ে উঠে।

কিন্তু ক্ষমতালোভে লালায়িত, পরশ্রীকাতরতায় অধৈর্য্য ও প্রতিহিংসায় উন্মত্ত বিভেদপন্থীরা এরপর প্রকাশ্যে ও গোপনে পার্টির দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনকে তাদের ক্ষমতা দখলের টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করল।

১৯৮২ সালের ২৪-২৭ সেপ্টেম্বর পানছড়ি থানাধীন এক গভীর জঙ্গলে অস্থায়ী ব্যারাক নির্মাণ করে জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায় যে, সম্মেলনে বিভেদপন্থীদের সামরিক অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনা ছিল। দুই নেতাকে ও তাদের সহযোগীদের গ্রেপ্তার করারও পরিকল্পনা হয়। দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে প্রকাশ্যে বিভেদপন্থীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, ক্যহাউ ভান্তে আর বুড়ো ওস্তাদ-এই তিন জনের পর্যায়ক্রমিক সভাপতিত্বে চার দিনব্যাপী এই জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে প্রথম জাতীয় সম্মেলনে কণ্ঠভোটেই কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন

সম্পন্ন হয়। সেসময় আলাদা কোনো প্যানেলের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় প্যানেলের বিপরীতে বিভেদপন্থীরা আলাদা প্যানেল উপস্থাপন করে। ফলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শুরুতেই সম্মেলনে বক্তৃতা মঞ্চে উঠে অপ্রত্যাশিতভাবে ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) উদ্যত কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, তারা দলীয় নীতি, আদর্শ ও কৌশলের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েছে। সাথে দ্রুত নিষ্পত্তির মতো অবাস্তব ও সস্তা শ্লোগানে বিভ্রান্ত করতে রাতারাতি দেশ উদ্ধারের নীতি ও কৌশল প্রতিষ্ঠা করার গালভরা বুলিও আওড়ায় সে। পলাশের বক্তব্যের বিপরীতে উষাতন তালুকদার কড়া ভাষায় বক্তব্য দেন এবং পলাশের বক্তব্য খন্ডন করেন। এভাবে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য চলতে থাকে। বিভেদপন্থীরা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম না হলেও, তারা মূলত বিদেশি শক্তির সাহায্য ও দ্রুত নিষ্পত্তির কথাই তুলে ধরতেন। আর তাদের বক্তব্যগুলো ছিল ভাঙনমূলক, আক্রমণাত্মক ও সৌজন্যতাবর্জিত। তারা কথায় কথায় বলতেন, দরকার হলে পার্টি ভাঙবে, তবুও তারা সরে যাবে না।

এরপর এক পর্যায়ে সভাপতি এম এন লারমা মঞ্চে ওঠেন। তিনি খুবই শান্ত, ধীর ও গঠনমূলক অথচ অতীব যুক্তিযুক্ত অভিভাষণে বাস্তব পরিস্থিতি সঠিক মূল্যায়ন করে গোটা পার্টি ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের উপর ঐতিহাসিক রূপরেখা শোনালেন। তিনি বললেন, 'দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের খাতিরে কি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে? আসলে এই প্রশ্নের উৎপত্তির কারণ হচ্ছে অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্য থেকে। সংগ্রাম দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাক, শান্তি ফিরে আসুক দ্রুত– এই কামনা সবাইয়ের। কিন্তু কারোর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী বা দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না। বাস্তবমুখী বাস্তবতা ও আত্মমুখী প্রস্তুতির নিরিখেই সংগ্রামের গতি নির্ধারিত হয়। তাই জনসংহতি সমিতিকে অবশ্যই আত্মমুখী প্রস্তুতি বা বাস্তবমুখী বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সংগ্রামের প্রতিটি কার্যক্রমকে নির্ধারণ করতে হবে। রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ আত্মমুখী প্রস্তুতি সত্যিকারভাবে বাস্তবমুখী বাস্তবতার সাথে সমন্বয় সাধন করে রচনা করা হয়েছে কিনা– এটিই হচ্ছে সংগ্রামের কার্যক্রমের প্রধান ধারা। বাস্তবতাকে এড়িয়ে, বাস্তবতাকে অস্বীকার করে আত্মমুখী প্রস্তুতির অর্থ হচ্ছে সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করা, সংগ্রামকে বানচাল করা। তাই জনসংহতি সমিতিকে এজন্য অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিত। কর্মীবাহিনীকে অবশ্যই অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্যের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে সংগ্রাম করতে হবে। এই অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্য হঠকারীতাবাদ, রক্ষণশীলতাবাদ ও পলায়নবাদের প্রবণতা প্রকাশ করে দেয়।' এম এন লারমার এই ভাষণ এতই জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ ছিল যে, তাতে জোঁকের মুখে ছাঁই পড়ার মতো হলো উপদলীয় চক্রান্তকারীদের।

যাই হোক, দুটি প্যানেলের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে প্রয়াত নেতাকে সভাপতি, বর্তমান নেতাকে সহসভাপতি ও ভবতোষ দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক করে যে প্যানেল প্রস্তাব করা হয় সেটিই বিপুল ভোটে জয়ী হয় এবং সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের রায় ঘোষিত হয়। যার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, কর্মীবাহিনী বিদ্যমান নেতৃত্বের অধীনেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে চায়। ফলে বিভেদপন্থীরা নিশ্চুপ হয়ে যায়, তারা আর সেব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেনি।

বলা হয়ে থাকে, এই ষড়যন্ত্রের পেছনে দেশি-বিদেশি গোষ্ঠী জড়িত রয়েছে বা এই ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে পা দিয়েই বিভেদপন্থীরা এই ১০ই নভেম্বরের ঘটনা ঘটায় এবং মহান নেতাকে হত্যা করে। যদিও এনিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো গবেষণা বা তথ্য নেই। পার্টির অন্যতম সিনিয়র কেন্দ্রীয় সদস্য শ্রী সত্যবীর দেওয়ান বলেন, দেশি-বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর গোয়েন্দা বিভাগের একটি অংশের ষড়যন্ত্র ও আর্থিক প্রলোভনের ফাঁদে পড়েই বিভেদপন্থীদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের বীজ রোপিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত দশই নভেম্বরের মত ঘটনা ঘটায় এবং বিভেদপন্থীরা বিদেশি সাহায্য ও দ্রুত নিষ্পত্তির তত্ত্ব হাজির করে ও প্রয়াত নেতা ও বর্তমান নেতার নীতি ও তত্ত্ব দিয়ে কিছুই হবে না বলে মতবাদের সৃষ্টি করে।

তবে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী যারা বা যেই হোক না কেন, এটা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, পার্টির অভ্যন্তরে যদি চার কুচক্রীর অস্তিত্ব বা অবস্থান না থাকত বা তারা যদি এই ষড়যন্ত্রে পা না দিত তাহলে কেবল বহিঃষড়যন্ত্রকারীর দ্বারা এমন ঘটনা ঘটানো কখনোই সম্ভব হতো না। যেকোনো বস্তুর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন অভ্যন্তরীণ ভিত্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, এক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে চার কুচক্রীই প্রধান ভূমিকা পালনকারী, বাস্তবায়নকারী এবং দায়ী।

বিভেদপন্থীদের কর্তৃক কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার দখল

দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের পর বিভেদপন্থীরা চুপ হয়ে যায় এবং ঐক্য মেনে নিয়েছি বলে বক্তব্য রাখে। কিন্তু সেই মেনে নেওয়া ছিল প্রকৃতপক্ষে শুধু মুখের কথা, মনের কথা নয়। কাজেই তারা অচিরেই আবারও নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে।

এবিষয়ে শ্রী সত্যবীর দেওয়ান বলেন, 'সম্মেলন শেষ হলে আমরা সবাই যে যার পোস্টিং-এ চলে আসি। কিন্তু এই সময়ে দেবেনের নেতৃত্বে থাকা ১ নম্বর সেক্টর থেকে একটি সামরিক দল দেবেনের নির্দেশে কেন্দ্রের দিকে পাঠানো হয়। তাদের গোপন উদ্দেশ্য সময়-সুযোগ বুঝে কেন্দ্রীয় দপ্তরে হামলা

পরিচালনা করা। পথে আমাদের দুই নম্বর সেক্টর হয়ে গেলেও তারা সেখানে কারো সাথে যোগাযোগ না করে গোপনে কেন্দ্রীয় দপ্তরের দিকে চলে যায়। সম্মেলনের পর সবাই যে যার কাজে ফিরে এসেছে, অথচ সেই দলটি গোপনে উল্টোদিকে রওনা দেয়। তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে, সম্মেলনের ফলাফল তারা বাহ্যিকভাবে মেনে নিলেও কার্যক্ষেত্রে তারা তা মেনে নেয়নি। দেখা গেল, সেই দলটি বিশেষ সেক্টরে গিয়ে কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার দখল করে বসে।' এর আগেও বিভেদপন্থীরা সুকৌশলে ও দুরভিসন্ধিমূলকভাবে পার্টির অধিকাংশ অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিজেদের দখলে রাখে। এভাবে বিভেদপন্থীরা অপরিণামদর্শীর মত বারবার পার্টির ঐক্য ও নীতি-আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে পার্টি তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের উপর আঘাত হানতে থাকে।

এই অবস্থা দেখে ৩ নম্বর সেক্টর থেকে একটি সামরিক দল, কমান্ড পোস্ট বি থেকে আরেকটি সামরিক দল বিশেষ সেক্টরের দিকে রওনা দেয়। বিশেষ সেক্টরটিতে বিভেদপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। বিশেষ সেক্টর এলাকায় কেন্দ্রীয় দপ্তর অবস্থান করলেও বিশেষ সেক্টর স্বতন্ত্রভাবে তার কাজ পরিচালনা করত। কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকেও একটি গ্রুপ প্রস্তুত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৪ জুন ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বাধীন ৩ নম্বর সেক্টর, কমান্ড পোস্ট বি ও কেন্দ্রীয় দপ্তর এর তিনটি গ্রুপ মিলে দখলকৃত কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার উদ্ধারে সেখানে সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। বিভেদপন্থীরাই আগে সশস্ত্র পদক্ষেপ নিলে পার্টির মূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকেনি। এই যুদ্ধে পার্টির মূল নেতৃত্বের পক্ষের দল বিজয়ী হয় এবং অস্ত্রাগার পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়, যদিও এর মধ্যে বিভেদপন্থীরা বেশ কিছু অস্ত্র, গোলাবারুদ সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এরপরপরই বিভিন্ন দিকে লাম্বা-বাদি নামে দুই পক্ষের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলা, যুদ্ধ শুরু হয়। এতে পাশাপাশি কর্মী বাহিনী ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক হতাশারও সৃষ্টি হয়।

সমঝোতার প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা

দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে বিভেদপন্থীদের অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা, কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার দখল ও ১৪ জুনের ঘটনা, আরও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সংঘাতের ঘটনা সত্ত্বেও এম এন লারমার বিশাল ও মহৎ হৃদয় যেন সদা সমঝোতা, ক্ষমা ও ভালোবাসার জন্য উন্মুখ থাকে। তাই তিনি তারপরও বোঝাপড়া ও সমঝোতার জন্য নানাভাবে চেষ্টা ও যোগাযোগ চালিয়ে যেতে থাকেন।

প্রয়াত নেতার অব্যাহত যোগাযোগ ও সমঝোতার চেষ্টার ফলে একসময় বিভেদপন্থীরাও সাড়া দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তৃতীয় পক্ষের সমন্বয়ে নভেম্বর মাসের একেবারে শুরুর দিকে নিরাপদ একটি এলাকায় উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সভা হয়। সেই সভায় 'ক্ষমা করা, ভুলে যাওয়া' নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর প্রয়াত নেতা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ঐক্য ও সমঝোতার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। উভয়পক্ষের সমঝোতা সভায় আগামী ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ কেন্দ্রীয় দপ্তরের ব্যারাকে উভয়পক্ষের অংশগ্রহণে সভা হবে, সেখানে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ এর অনুগত দল উপস্থিত হবে এবং উভয়পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে আবার ঐক্যবদ্ধ হবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এর পরপরই প্রীতি কুমারের একটি চিঠির মাধ্যমে উক্ত তারিখের সভা বাতিল হয়ে যায় এবং ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়। যারা পরিণতি হয় রক্তাক্ত দশই নভেম্বর।

দশই নভেম্বর, ১৯৮৩

১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে গভীর জঙ্গলে একটি ঢালু পাহাড় দেখে সেখানে কেন্দ্রীয় দপ্তরের জন্য স্থায়ী ব্যারাক নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হলো। পাহাড়ের পাদদেশে পূর্ব ও পশ্চিম দুইদিকে বেশ সুন্দর ঝিরিও রয়েছে, যা খাবার ও স্নানের পানি যোগান দেবে। পাহাড়টি উত্তরদিকে উঁচু অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে দক্ষিণে সামান্য ঢালু হয়ে নীচে নেমে এসেছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাহাড়টির মাঝ থেকে নীচের দিকে চারটি ব্যারাক নির্মাণ করা হল। পজিশন দেখে মোট চারটি সেন্ট্রি পোস্ট রাখা হল। যার মধ্যে একেবারে উপরে ছিল আরেকটি পোস্ট।

প্রথমদিকে ছিল মূলত তিনটি ব্যারাক। পাহাড়ের মাঝামাঝিতে সবার উপরে ছিল প্রয়াত নেতাদের ব্যারাক সেখানে প্রয়াত নেতার সাথে থাকতেন মেজর পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), নেতার বড় ভাই শহীদ শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান), অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত), সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মনিময় দেওয়ান স্বাগত, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অমর কান্তি চাকমা মিশুক, কর্পোরেল সন্তোষময় চাকমা সৌমিত্র, জাপান মারমা, নিতেন ওস্তাদ প্রমুখ। তবে, ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে গুণেন্দু বিকাশ চাকমাও সেই ব্যারাকে যোগ দেন এবং প্রয়াত নেতার বিছানার বিপরীতেই তার বিছানা পাতেন। সেখানে বিভেদপন্থী গিরি (ভবতোষ দেওয়ান) আর বিনয় কৃষ্ণও ছিলেন, ঘটনার কয়েকদিন আগে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তার নীচের ব্যারাকে থাকতেন বর্তমান নেতা সন্তু লারমা এবং তাঁর সাথে কালী মধাব চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান রিপ, উত্তরণ বাবু, দেবংসী বাবু, লক্ষীপ্রসাদ চাকমা, মনিময় দেওয়ান, তাতিন্দ্র লাল চাকমা, প্রণতি বিকাশ চাকমা ভিক্টর, সুবর্ণ চাকমা, কল্যাণময় খীসা (জুনি), কর্পোরেল অর্জুন ত্রিপুরা, সুবীর ওস্তাদসহ অন্যান্যরা। এই ব্যারাকটি কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর হিসেবেও ব্যবহৃত হত। দুটো ব্যারাকের মাঝে দূরত্ব ছিল প্রায়

২০ গজের মত। দুই ব্যারাকের পাশেই পূর্ব দিকে একটি সেন্ট্রি পোস্ট ছিল। দ্বিতীয় ব্যারাকের দক্ষিণ-পূর্বদিকে নীচে ও ঝিরির একটু উপরে ছিল ছোট একটা ব্যারাক, সাথে খাবার ঘর। তার সাথে একটি সেন্ট্রি। এর ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর আরেকটি সেন্ট্রি।

এই সময়ে একই সাথে প্রীতি গ্রুপের লোকদের সাথেও নানাভাবে যোগাযোগের চেষ্টা চলতে থাকল একটা বোঝাপড়া বা ঐক্যমত্যে পৌঁছার আশায়। এসময় সবখানে কর্মীদের মধ্যে, জনগণের মধ্যে নানা আশা-হতাশার কথা, আলোচনা চলছিল। বোঝাপড়া হওয়া না হওয়া নিয়ে। এসময়টাতে বর্তমান নেতা সন্তু লারমা একবার বললেন, 'না, এদেরকে নিয়ে বোঝাপড়া হবে না, এরা যেকোনো সময় আক্রমণ করতে পারে।' বিশেষ করে এই ব্যারাক থেকে গিরি (ভবতোষ দেওয়ান) চলে যাওয়ার পর। গিরি আর বিনয় কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর বর্তমান নেতা আক্রমণ হতে পারে বলে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, (যা কয়েকদিনের মধ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয়)। এসময় বর্তমান নেতা প্রণতি বিকাশ চাকমাসহ কয়েকজনকে ডেকে পাহাড়ের উপরের দিকে আরও ব্যারাক তুলে সেখানে প্রয়াত নেতাকে রাখার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিলেন। কারণ, তার মত হল, যদি বিদ্যমান ব্যারাক আক্রমণের শিকার হয়, তখন প্রয়াত নেতার পক্ষে সেখান থেকে সরে যাওয়া কঠিন হবে। তাই তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ও সুবিধাজনক পাহাড়ের উঁচু স্থানে তার জন্য আলাদা ঘর নির্মাণ করা উচিত হবে। তখন নানা খবর আসছিল। কখনো খবর আসছিল, হামলা করতে আসবে, কখনো খবর আসছিল, হামলা করবে না বলে।

প্রণতি বিকাশ চাকমা বলেন, 'পরিস্থিতি বিবেচনা করে বর্তমান নেতার পরামর্শ অনুসারে, অনতিবিলম্বে পাহাড়টির উঁচু স্থানে পূর্ব পশ্চিম বরাবর পাশাপাশি তিনটি ছোট ব্যারাক নির্মাণ করা হল। দুই পাশে দুটি নিরাপত্তা ব্যারাক, মাঝখানে প্রয়াত নেতার ব্যারাক। ঘরগুলোর নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর বর্তমান নেতাকে জানানো হল যে, স্যার যে কোনো সময় যেতে পারবেন। আমরা নির্ধারিত সদস্যরা ইতিমধ্যে সেখানে অবস্থান নিয়েছি। সুবীর ওস্তাদ ও নিতেন ওস্তাদও গিয়েছেন। নিতেন ওস্তাদ স্যারের সাথে থাকবেন, সুবীর ওস্তাদ পরে নেমে আসবেন এমন পরিকল্পনা করা হল। পশ্চিম পাশের ব্যারাকটাতে আমি অবস্থান নিলাম। এই তিনটি ব্যারাকের নিরাপত্তার মূল দায়িত্ব দেয়া হল আমাকে। পূর্ব পাশের ব্যারাকটাতে একটা এলএমজি সেন্ট্রি পোস্ট রাখা হল। আমরা প্রায় সপ্তাহ খানেক হয়েছে অবস্থান নিয়েছি, কিন্তু প্রয়াত নেতা তখনো যাননি। সপ্তাহ খানেক পর তিনি খুলে বললেন, আমি সেখানে গেলে কিভাবে নিয়মিত স্নান করতে, খাওয়া-দাওয়া করতে ওঠানামা করব। এতবড় পাহাড়ে কিভাবে আমার পক্ষে সম্ভব হবে। তিনি বললেন, চিন্তা করো না, যা হবার হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, খাবার আর স্নানের পানি আমরা ব্যবস্থা করব। এটা শুনে তিনি একটু হাসলেন এবং বললেন, একটা মানুষকে কি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমন পাহাড়ে খাবার তুলে খাওয়ানো, পানি তুলে স্নান করানো সম্ভব? শেষ পর্যন্ত প্রয়াত নেতা সেখানে গেলেন না। প্রয়াত নেতা যখন গেলেন না, তাই নিতেন ওস্তাদও নেমে আসলেন। ১০ই নভেম্বর হামলার ঠিক দুই দিন আগে প্রয়াত নেতা আমাকেও বললেন, তুমিও তো এখানে আসতে পারো, যেহেতু আমার যাওয়া হলো না।'

৭ নভেম্বর বাংলাদেশ বেতার থেকে বঙ্গোপসারে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হওয়ার খবর পরিবেশিত হয়। সেই জলোচ্ছ্বাস বাড়তে বাড়তে প্রথমদিকে হুশিয়ারি সংকেত, পরে বিপদ সংকেতে পরিণত হল। সেই বিপদ সংকেত দ্রুত ৩, ৪, ৫ হতে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতে রূপ নিলো। ৭-৮ নভেম্বর আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হলো। প্রায়ই ঝড়ো হাওয়া গভীর জঙ্গলের পরিবেশটাকে আরও বিষণ্ন করে তুলছে। ৯ তারিখ বৃষ্টির মাত্রা কিছুটা কমেছে বটে, কিন্তু বাতাসের প্রবাহ থামেনি। গত ২/১ দিন ধরেই প্রয়াত নেতা অসুখে ভুগছিলেন, খাবারও তেমন খেতে পারছিলেন না। রাত ঘনিয়ে আসার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন, আর নিরাপত্তা রক্ষীরা যে যার সেন্ট্রির দায়িত্ব পালন শুরু করলেন। রাত ৮টা নাগাদ পাশের ঝিরিতে কী যেন একটা গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা গেল। দু'জন সৈনিক টর্চলাইটের আলো দিয়ে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করে আসলো। কিন্তু তারা কিছু দেখতে না পেয়ে হয়তো ভালুক বা বনের কোনো পশু হবে মনে করে ফিরে আসলেন নিশ্চিন্ত মনে।

১০ নভেম্বরের ভোর রাত প্রায় সাড়ে তিনটার কাছাকাছি। এমনি সময়ে হঠাৎ কার্বাইনের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তেই প্রথম ব্যারাকের নীচের দিকে উঠোনে 'মুই রিপন, মুই রিপন', ওমা..ওমা..করে কাতড়াতে কাতড়াতে উঠোনে লুঠিয়ে পড়লেন নেতার একনিষ্ঠ সেবাশুশ্রূষাকারী ও সহযোদ্ধা মেজর পরিমল চাকমা রিপন। এরপর উত্তর-পূর্ব দিক থেতে শুরু হল পাশাপাশি দুই ব্যারাকের দিকেই মুহুর্মূহ গোলাবর্ষণ। হামলাকারী বিশ্বাসঘাতকেরা নিজেদের পরিচয় লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিকৃত গলার স্বরে 'ইয়া আলী...ইয়া আলী..আবুল্যা এডভান্স..এডভান্স..বলে ব্রাশ ফায়ার করছিল আর গ্রেনেড নিক্ষেপ করছিল। হামলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রয়াত নেতার ব্যারাকের সদস্যরা। গুণেন্দু বিকাশ চাকমার মতে, প্রয়াত নেতাসহ তার সারির সবাই সাদা গেঞ্জি পড়ে শুয়েছিলেন। রাত্রে সেটা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল। সম্ভবত সে কারণেই শত্রুদের আরও সুবিধে হয়েছিল। তিনি অবশ্য সেই ভয়াবহ হামলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যান। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মনিময় দেওয়ান ও কর্পোরেল অর্জুন উত্তর পার্শ্বে

অবস্থান নিতে গিয়ে শত্রুদের ব্রাশ ফায়ারের মুখে পড়ে শহীদ হন। অপর ব্যারাকের বর্তমান নেতা, কালী মধাব চাকমা, পেলে বাবুসহ অন্যান্যরা সরে পজিশন নিয়ে কোনোমতে বাঁচতে সক্ষম হন। শত্রুদের আচমকা আক্রমণে তাৎক্ষণিকভাবে তেমন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

জানা যায়, শহীদ সৌমিত্র চাকমা আহত অবস্থায় দুইদিন বেঁচেছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রয়াত নেতা প্রথমে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। কিন্তু অসুস্থ শরীর ও দুর্বলতা হেতু সরে যেতে পারেননি। শত্রুরা ব্যারাকের ভিতরে ঢুকে লীডারকে আহতাবস্থায় দেখতে পায়। তখন নেতা হত্যাকারীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পান। প্রয়াত নেতা প্রথমে বলেন, 'কী তোমাদের ক্ষমা করে আমরা অন্যায় করেছি? আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে? যাক, তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করো না কেন জাতির দুর্দশাকে তোমরা কখনো ভুলে যেয়ো না আর জাতির এ আন্দোলনকে কখনো বানচাল হতে দিও না।' নেতার কথা শুনে উপস্থিত দুই বিভেদপন্থী নীরবে চলে যায়। তারা আর ফিরে আসেনি। ততক্ষণে তাদের মধ্যে কড়া ভাষায় কথা কাটাকাটি করতে শোনা যায়। সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ গতিতে কে একজন এসে নেতার গায়ের উপর উঠে কোনো কথা না বলে ব্রাশ ফায়ার করে চলে যায়। এর কিছুক্ষণ ঘটনাস্থলটি কেন্দ্রীয় দপ্তরের যোদ্ধাদের দখলে চলে আসে এবং বিভেদপন্থীরা পালিয়ে যায়। এভাবেই সেদিন বিভেদপন্থীদের নির্দয় ধ্বংসলীলা সাঙ্গ হয়।

সেদিনের ঘটনার কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রণতি বিকাশ চাকমা বলেন, 'সেদিন আমিও অসুস্থ ছিলাম, শরীরে জ্বর ছিল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমরা কয়েকজন উঠোনে আগুন দিয়ে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। ঘুমিয়ে পড়ার পর সম্ভবত ২/৩ ঘন্টার মত হবে না, গুলির আওয়াজ শুনি। প্রথমে শুয়েই ছিলাম। গুপ্তকে বললাম, একটু শুনে দেখতো। গুপ্ত একটু সতর্কতার সাথে বের হয়ে পর্যবেক্ষণ করে বলল, দাদা, শুনুন তো নীচের ব্যারাকের দিকে গুলির আওয়াজ হচ্ছে। এটা শোনার সাথে সাথে আমি উঠে পড়লাম। আমি কান পেতে শুনে গুপ্তকে বললাম, ফায়ার লাইন তো একদিকে, হয়ত কোনো কারণে মিসফায়ার হচ্ছে। তাছাড়া সেখানে তো অনেক সিনিয়র কমান্ডার আছেন। তারপরও আমরা আমাদের ব্যারাকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করলাম। কিন্তু তখনো আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলাম না, তাই আন্দাজে কোনোদিকে ফায়ারও করতে পারছিলাম না। তবে এখন আমার মনে হয়, এলএমজি পোস্ট থেকে যদি আমরা কাভারিং ফায়ার করতাম, তাহলে হয়ত শত্রুরা আরো আগে সরে যেতে বাধ্য হত। কিন্তু আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, ফায়ারিং লাইন আসছিল আমাদেরই নীচের ব্যারাক থেকে। তাই আমদের এমন ধারণাও ছিল আমাদের লোকরাই হয়ত গুলি করছে।

কিছুক্ষণ পর যখন গুলিবর্ষণ থামল, তখন একধরনের পিনপতন নীরবতা নেমে এল। চতুর্দিক সুনসান, নিস্তব্ধ। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা জন্ম নিল। কিন্তু ইচ্ছে করলেও এখন সেদিকে যেতে পারছি না। তখনও অন্ধকার। গুপ্ত বলল, নাকি দেখে আসব দাদা? আমি বললাম, একটু দাঁড়া, একটু আলো ফুটুক। আমার খটকা লাগল, ফায়ার বন্ধ হলো, তারা তো অন্তত খবরটা দিতে পারে, অথচ কোনো খবরাখবর নেই। কিছুক্ষণ পর, ৫টা/৫:৩০টা হবে, একটু অন্ধকার কমে আসলে দৌঁড়ে নিতেন বাবু আসলেন এবং আমাকে দেখে ব্যারাকের প্রাঙ্গণে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, মাম শেষ, মাম সব শেষ! আমি বললাম, কী শেষ, কী শেষ হয়েছে? কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিতেন বাবু কিছুই বলতে পারলেন না, শুধু শেষ, শেষ ছাড়া। কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে ঘটনার তিনি যা দেখেছেন তা খুলে বললেন। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রয়াত নেতার পড়ে থাকার মর্মান্তিক দৃশ্য বর্ণনা দিলেন। আমরা সবাই নির্বাক হলাম কিছুক্ষণের জন্য। এবার আমি আর নিতেন নীচে ঘটনাস্থলে গেলাম। ঘটনা তো দেখলাম, কিন্তু এখন আমার চিন্তার বিষয় হল, বর্তমান নেতা ও অন্যান্যরা কোথায় আছেন, তারা ঠিক আছেন কিনা। সবগুলো ব্যারাক ঘুরে দেখলাম, কোথাও কাউকে দেখলাম না। কিছুক্ষণ পর কালীমাধব বাবুকে আসতে দেখলাম। সবার মুখ তখন শোকে, হতাশায় কালো। আমি কালীমাধব বাবুকে বললাম, তুং মামু (বর্তমান নেতা) কোথায়? তিনি বললেন, কোথায় গেছেন বা আছেন সেটা তো এখনো জানতে পারিনি। আশেপাশে কোথাও কারো সাড়াশব্দও নেই তখন। কিছুক্ষণ পর চারদিক পরিষ্কার আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে কিছু কিছু লোক এদিক-ওদিক থেকে আসতে লাগল। এরপর আমরা নীচে নেমে ব্যারাকের দক্ষিণ দিকে ছড়া/ঝিরি বরাবর কেউ আছে কিনা খুঁজতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমরা সেখানে ঝিরির পাড়ে বর্তমান নেতা আর দীপঙ্কর এর সাথে দেখা হলো।

১০ই নভেম্বরের ঘটনার পর জনগণের কাছে তাদের বিশ্বাসঘাতকের চরিত্র এবং তারা যে বিভেদপন্থী তা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। এরপর থেকে সাধারণ জনগণ আর তাদের কথায় বিশ্বাস করেনি এবং তাদের উপর আস্থা রাখেনি। কর্মী বাহিনীর মধ্যেও তাদের ব্যাপারে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকেনি। সাধারণ মানুষ কেউই ১০ই নভেম্বরের হামলা এবং এম এন লারমাকে হত্যা মেনে নিতে পারেনি। বলতে গেলে, জনমত সম্পূর্ণ তাদের বিপরীতে চলে যায়।

সত্যবীর দেওয়ান বলেন, এরপর পার্টির মূল নেতৃত্ব থেকে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলা তথা বিভেদপন্থীদের চূড়ান্তভাবে

দমনের উদ্দেশ্যে দেবাশীষ বাবুকে প্রধান ও পেলে বাবুকে সহকারী কমান্ডার করে 'ডিসিডেন্ট ডেসট্রাকসন ফোর্স, সংক্ষেপে 'ডিডিএফ' নামে একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়। দেবাশীষ বাবু ছিলেন উত্তর দিকে কেন্দ্রীয় দপ্তরের এলাকায়, আর পেলে বাবু দায়িত্ব পালন করেন দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণদিকে ১ নম্বর সেক্টরে পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন গৌতম কুমার চাকমা, সেখানে আমিও ছিলাম সেই সময়। তখন বিভেদপন্থীদের মূল সামরিক দলগুলো প্রায়ই চেঙ্গী নদীর পশ্চিম তীর এলাকায় অবস্থান করছিল। আমাদের ডিডিএফ' এর বাহিনী চেঙ্গীর পূর্ব থেকে পশ্চিম কূলে পার হওয়ার সাথে সাথে বিভেদপন্থীরা সর্বসাকুল্যে ২৩৩ জনের একটি দল নিয়ে ১৯৮৫ সালে রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এভাবে বিভেদপন্থীদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

মরেও অমর তারা

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে শাসক বাহিনীর সাথে জনসংহতি সমিতির যোদ্ধারা অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। পার্টি সদস্যদের সাহসী, চৌকস ও গতিময় গেরিলা যুদ্ধকৌশলের কাছে সেসময় শাসকগোষ্ঠীর বহু সৈন্যদল বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। শাসকবাহিনীর সাথে এইসব যুদ্ধে অনেক পার্টির সদস্য বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন। তারাও নিশ্চয়ই জুম্ম জাতির বীর শহীদ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু গভীর আফশোস ও সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, যে নেতার চিন্তা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সামরিক শাখা গঠিত হলো, আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত হলো সেই বাহিনীরই বিপথগামী কিছু বিভেদপন্থীদের হাতে নিহত হতে হলো মহান নেতাসহ আরও আট সহযোদ্ধাকে। সেদিন প্রয়াত নেতার সাথে শহীদ অন্যান্য সহযোদ্ধারা হলেন-

শহীদ মেজর পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), তিনি দীর্ঘ এক যুগ ধরে প্রয়াত নেতার পাশে পাশে থেকে নিরাপত্তা ও সেবা শুশ্রূষার দায়িত্বভার নিজেই বহন করতেন। তিনি একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সৎ, বিনয়ী, সাচ্চা দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি সদ্য বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। তাঁর বাড়ি ছিল খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার নৌকা ছড়া গ্রামে।

শহীদ শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান), তিনি প্রয়াত নেতার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই। ঘটনার মাত্র একদিন আগে তিনি প্রয়াত নেতার অসুখের খবর শুনে তাঁকে দেখতে সেখানে আসেন। তিনি পিআরসি'র প্রথম সম্পাদক ও যুব সমিতির আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন। জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি এক জনদরদী ও সামাজিকভাবেও পরোপকারী মানুষ ছিলেন। তাঁর পত্নী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে রেখে তিনি শহীদ হন। তাঁর বাড়ি ছিল খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার মঞ্জু আদাম নামক গ্রামে।

শহীদ অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত), তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের সহকারী পরিচালক ছিলেন। কর্মজীবনের প্রথমদিকে তিনি খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পরে রাঙ্গামাটি শাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতা করার সময়েই তিনি জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার সাথে তিনি পার্টির অর্পিত দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক কন্যা রেখে তিনি শহীদ হন। সেদিনই পরিবারের সদস্যদের তাঁর মিলিত হবার কথা ছিল। তাঁর বাড়ি ছিল খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার গোলাবাড়ি নামক এলাকায়।

শহীদ কল্যাণময় খীসা (জুনি), তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের আঞ্চলিক পর্যায়ে সহকারী পরিচালক এবং পরে আর্মোরার বিভাগেরও একজন সহকারী ছিলেন। ডাক্তারি ও সেলাই কাজেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন এবং স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা রেখে শহীদ হন। তাঁর বাড়ি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার চম্পাঘাট নামক এলাকায়।

শহীদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মনিময় দেওয়ান স্বাগত, তিনি সামরিক শাখার একজন বীরযোদ্ধা এবং যুব সমিতি ও ছাত্র সমিতির একজন সহকারী পরিচালক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএস অনার্স কোর্সের ছাত্র ছিলেন। তিনি সৎ, সাহসী ও একনিষ্ঠ এক কর্মী ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর বাড়িও ছিল খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার মঞ্জু আদাম নামক গ্রামে।

শহীদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অমর কান্তি চাকমা মিশুক, তিনি ২ নম্বর সেক্টরের একজন জোন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন সংগঠক ও কৌশলী কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মাত্র সপ্তাহখানেক আগে তিনি তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে বলে খবর পেয়েছেন। তার স্ত্রী ও নবজাত শিশুকে রেখে তিনি শহীদ হন। তাঁর বাড়ি রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার বামে আটরকছড়া গ্রামে।

শহীদ কর্পোরেল অর্জুন ত্রিপুরা, তিনি একজন সৎ, সাহসী ও একনিষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার বিধবা মায়ের জন্য কিছু কাপড় যোগাড় করে রেখেছিলেন। তার মাকে সান্তনা দেবার জন্য চিঠিও লিখেছিলেন।

শহীদ কর্পোরেল সন্তোষময় চাকমা সৌমিত্র, ঘটনার দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হওয়ার দুইদিন পর তিনি মারা যান। তাঁর বাড়ি খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার করল্যাছড়ি এলাকায়।

উপসংহার

১০ই নভেম্বরের ঘটনা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ভুলে যাওয়ার বিষয়ও নয়। বরঞ্চ ১০ই নভেম্বরের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের রয়েছে অনেক কিছু এবং বারবার একে স্মরণ করতে হবে।

বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীরা তাদের ক্ষমতার জন্য এত মদমত্ত, প্রতিহিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় এতই মগ্ন এবং নিজেদের ষড়যন্ত্রে ও অল্পবিদ্যার অহংকারে এতই অন্ধ ছিলেন যে, তারা বুঝতে পারেননি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে তারা নিজেদেরই কবর রচনা করছিলেন এবং সাথে জুম্ম জাতির আন্দোলনকে ও প্রগতিকে কত পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন এবং জুম্ম জাতির প্রেম ও বিশ্বাস ভরা বুকে কী কুটিলতার ছুরি বসিয়ে দিচ্ছিলেন। দশই নভেম্বর না হলে জুম্মদের আন্দোলন আরও ব্যাপকভাবে এগিয়ে যেতে পারতো, মহান নেতাকে এত অসময়ে হারাতে হতো না। কিন্তু তারপরও কি আমরা জুম্মরা সবাই দশই নভেম্বর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছি? আমাদের কি আদৌ উচিত শিক্ষা হয়েছে? যদি হতো, তাহলে কখনোই চুক্তিবিরোধী প্রসিত-রবিশংকর গ্রুপের সৃষ্টি হতো না, আবার পার্টিকে ক্ষতবিক্ষত করার প্রয়াসে সংস্কারপন্থী গ্রুপের সৃষ্টি হতো না।

বলাবাহুল্য, প্রসিত-রবিশংকর গ্রুপ কর্তৃক আলাদা দল গঠন এবং চুক্তি বিরোধিতার নামে প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য ও চুক্তির পক্ষের জনগণকে অপহরণ, হত্যা ও নাজেহাল করার যে কার্যক্রম শুরু করা হয় সেটাও বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রের নয়া সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। তারা চুক্তি বাস্তবায়নের ন্যুনতম সময় ও সুযোগ না দিয়ে শুরু থেকেই জনসংহতি সমিতির উপর আঘাত হেনে চুক্তি বাস্তবায়নে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং জুম্মদের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার পাঁয়তারা চালায়।

সর্বশেষ ২০০৭ সাল হতে দেশে জরুরি অবস্থা ও সেনাবাহিনী কর্তৃক বিরাজনীতিকরণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে দূর্বল ও বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করলে সেই ফাঁদে পা দিয়ে সংস্কারপন্থীরাও নব্য বিভেদপন্থীর ভূমিকা গ্রহণ করে পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পার্টি ও জনগণকে আবার দ্বিধাবিভক্ত করার চেষ্টা করে আন্দোলনে ব্যাপক ক্ষতি ডেকে আনে। তাদের এহেন পদক্ষেপ সেনাবাহিনীর পার্টি ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন বিরোধী ষড়যন্ত্রকেই সহযোগিতা ও পরিপুষ্ট করে।

তাই, দশই নভেম্বর কি শুধু প্রয়াত নেতাসহ শহীদদের স্মরণ, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, হত্যাকারীদের নিন্দা জ্ঞাপন, নিশ্চয়ই নয়। অবশ্যই প্রয়াত নেতাসহ শহীদদের স্মরণ, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, তাদের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীদের মুখোশ উন্মোচন করা এবং নতুন প্রজন্ম ও জনগণের কাছে তুলে ধরা আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে এবং তা আমাদের করতে হবে। কিন্তু এর পাশাপাশি, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, প্রয়াত নেতার চিন্তাধারা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, নীতি, কৌশল, তাঁর জীবনাচার ও সংগ্রামকে অধ্যয়ন, অনুধাবন, অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করা; জুম্মজাতির মুক্তি ও জাতিগত সমস্যা সমাধানের জন্য কেন তাঁর চিন্তাধারা জরুরি তার গুরুত্ব অনুধাবন করা।

১০ই নভেম্বরের তাৎপর্য এবং এর থেকে শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব অদ্যাবধি শেষ হয়নি। যতদিন অধিকার আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে, যতদিন প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যেকার সংগ্রাম থাকবে ততদিন এর গুরুত্ব জীবন্ত থাকবে। এটা কেবল এম এন লারমাকে স্মরণ করা বা এম এন লারমার সাথে বিভেদপন্থীদের দ্বন্দ্বের বিষয় নয়, এটা সঠিকতা ও বেঠিকতার মধ্যে বা ভুল ও নির্ভুলের সঠিকতা ও নির্ভুলতাকে চিহ্নিত করার শিক্ষারও বিষয়।

> দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ... এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংগ্রাম এখনও শেষ হয়ে যায়নি

জিকো চাকমা

আসছে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২ বছর পূর্ণ হবে। স্বাধীনতার ৫২ বছরের ইতিহাসে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে এ দেশের। কখনো গণতান্ত্রিক উপায়ে আবার কখনো রক্তাক্ত সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। এই ৫২ বছর ধরে যারা এদেশকে শাসন করে গেছেন, কোনো শাসকই প্রকৃতপক্ষে এদেশের সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দেয়নি। বিপরীতে ক্ষমতাবানরা হয়েছে আরো অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং গরিবরা হয়েছে আরো গরিব। নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে দেশের সংবিধানকে কাঁটাছেড়া করেছে অসংখ্যবার। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সব দলই তাদের প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। যার ফলে সন্ত্রাস, দূর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের হীন তৎপরতা এদেশ থেকে দূর করা যায়নি।

স্বাধীনতার ৫২ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও এদেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি আসেনি, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। ঠিক এই সময়টাতে এদেশের সাধারণ মানুষগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে, দেশ থেকে সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, দূর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের হীন তৎপরতাকে রুখে দিতে জুম্ম জনপদের প্রিয় নেতা তথা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার লড়াই ও সংগ্রামকে পাঠ করা, তার প্রদর্শিত আদর্শকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাওয়া এদেশের তরুণ প্রজন্মের মুখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ডাক নাম ছিল মঞ্জু। ১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর থানার মহাপুরম গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬০ এর দশকে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করার উদ্যোগ নিলে তরুণ লারমা জুম্ম জনগণের ভিটেমাটি ডুবিয়ে দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করার রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হতে হয় তাঁকে। পরবর্তীতে গণপরিষদের সদস্য ও স্বাধীন বাংলাদেশে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত জুম্ম জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত সকল ধ্যান-ধারণাকে বদলে দিয়ে সমাজে প্রগতিশীল দর্শনের সফল অনুশীলনে তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ব্যক্তি হিসেবে এদেশের সংখ্যালঘু একটা জাতিগোষ্ঠীর বংশোদ্ভূত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনো জাতিগত সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ থাকেননি। ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবরে খসড়া সংবিধানের ওপর কথা বলতে গিয়ে এম এন লারমা একাই সেদিন লড়াই করে গিয়েছিলেন। তরুণ আওয়ামী লীগের এমপিরা সেদিন তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তাকে উপহাসও করেছিলেন চরমভাবে। কথা বলতে গিয়ে বার বার বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সংসদে কথার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন বার বার। তবুও তিনি থামেননি। জাত্যভিমান, দাম্ভিকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তায় ভরপুর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের তৎকালীন তরুণ এমপিরা এম এন লারমার সমস্ত যৌক্তিক আবেদন নিবেদনকে সেদিন প্রত্যাখান করেছিল। এটা ছিল তার ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা।

সংবিধানে এদেশের আদিবাসীদের ওপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি সেদিন প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা তা ভালোভাবে বিবেচনা করে যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত। আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে আসছে। বাংলাদেশের সাথে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ-দাদা, চৌদ্দপুরুষ কেউ বলে নাই- আমি বাঙালি। আমার সদস্য-সদস্যা ভাইবোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালি হিসেবে পরিচিত করতে চায়।'

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদীয় জীবনে সাংসদ হিসেবে যে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, দেশপ্রেম, সততা, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নীতি-আদর্শের প্রতিফলন দেখিয়েছিলেন, সেটা বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তার প্রত্যেকটা বক্তব্য আজোও অনেক প্রাসঙ্গিক। ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের ওপর সামগ্রিক আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, "আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। আজ আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরি, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয়

করে নৌকা বেয়ে, দাড় টেনে চলেছেন, রোদ বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আজকে যারা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি।" সত্যিকার অর্থে আজও এই কৃষক শ্রমিক, জেলে মাঝি মাল্লাদের অধিকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি।

একদা সামন্তীয় জুম্ম সমাজে নারীকে পুরুষের ভোগ্যবস্তু, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ও পারিবারিক দাসী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা হতো না। অপরদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার সেনা সমাবেশ, একি সাথে লক্ষ লক্ষ বাঙালি মুসলমানদের এখানে পূনর্বাসন, সাথে তাদের দ্বারা জুম্ম জনগণের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন, গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তরকরণ এইসব শ্বেত সন্ত্রাসের অন্যতম শিকার ছিল জুম্ম নারী সমাজ। সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারী বাঙালি মুসলমানরা জুম্ম নারীদের পাইকারিভাবে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, পথে-ঘাটে শ্লীলতাহানি, জোরপূর্বক বিবাহ ও অপহরণ নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে কাপ্তাইয়ে সেনাবাহিনীর ৬ সদস্য কর্তৃক এক জুম্ম ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায় এক জুম্ম নারীকে সেটলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এটাই তার জ্বাজ্জল্য প্রমাণ। আজকের জুম্ম নারী সমাজের এমন ভবিষ্যৎ এম এন লারমা সেই ৫১ বছর আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন তখন থেকেই।

পারিবারিক দাসত্ব ও পুরুষের চরম আধিপত্যের বিপরীতে জুম্ম নারী সমাজ তথা এদেশের সমগ্র নারীদের করুণ অবস্থা দেখে তিনি খুবই পীড়িত হতেন। সেকারণেই সংবিধান রচনাকালে তিনি বলেছিলেন, 'সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এই সংবিধানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরুপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষরা যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। আজ পল্লীর আনাচে-কানাচে আমাদের যে সমস্ত মা-বোনকে তাদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, তাদের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। সেই মা-বোনদের জীবনের কোনো গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি।' জুম্ম সমাজের সামন্তীয় শাসন শোষণ ও জাতীয় জীবনে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের শিকার জুম্ম নারীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এক দুর্দমনীয় সংগ্রামী শক্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সে কারণেই ১৯৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি গঠনের মধ্যে দিয়ে জুম্ম নারী সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করেছিলেন।

বর্তমান বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর যে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটা ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে দাঁড়িয়ে সংবিধান বিলের ওপর বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন, 'গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপর নাই'। আমি আজ কামনা করি, তাই হোক।'

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি কত গভীর ভালোবাসা ছিল সেটা ১৯৭৩ সালের ২৩ জুন জাতীয় সংসদে প্রতিরক্ষা ভাবনা নিয়ে রাখা তার বক্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি সেদিন গোটা তিনটা বাহিনীর (জল, স্থল ও আকাশ) জন্য ডিফেন্স বাজেট ৪৭ কোটি টাকার বদলে প্রত্যেক বাহিনীর জন্য ৪৮ কোটি করে বরাদ্দ চেয়েছিলেন। তিনি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং সিভিল গভর্নমেন্টকে সাহায্য করার জন্য আমাদের বাহিনীগুলোতে রণ-সম্ভার বেশি থাকতে হবে। তিনি সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সরকারকে মনোনিবেশ করার আহবান জানান। কিন্তু সেদিন তার প্রত্যেকটি কথাকে অগ্রাহ্য ও অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল। সেদিন যদি তার কথামতো দেশের সেনাবাহিনীকে সুশিক্ষিত ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল করা হতো, তাহলে হয়তো দেশের অভ্যন্তরে রক্তক্ষয়ী সেনা অভ্যুত্থানে দেশের প্রধানদের প্রাণ ঝরে যেত না।

যে চারটি মূলনীতির (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) ভিত্তিতে এই দেশ পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল, সেই চার মূলনীতি থেকে অনেক আগেই সরে গেছে আমাদের প্রিয় স্বদেশ। জাতীয়তাবাদের নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। দেশের সংবিধানে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারোসহ ৫০ টির অধিক জাতিগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, উপজাতি হিসেবে অভিধা দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে সংবিধানে জাতি হিসেবে স্বীকার করা হয়নি; উপরন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে দেশের এই পরিণতির কথা এম এন লারমা সেসময় মূল্যায়ন করেছিলেন। সে প্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন, 'একদিকে হিংসাদ্বেষ-বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন-

ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এমন একটা ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্ষমতাবলে সরকার একটা লোককে এক পয়সার অধিকারী হতে দেবেন এবং অন্য একটা লোকের জন্য এক কোটি টাকার মালিকানার অধিকার রেখে দেবেন।' তার সেই ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আজ সত্যতে পরিণত হয়েছে। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! আজ সমাজতন্ত্রের নামে আমাদের দেশে উচ্চ শ্রেণির দূর্নীতিবাজ, ঘুষখোর আর ক্ষমতার অপব্যবহারকারীরাই দাপটের সাথে এদেশ পরিচালনা করছে। সমাজতন্ত্রের বদলে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, দূর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের।

দেশে গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার, ভয়ের সংস্কৃতি চালু করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় কথা ছিল এদেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটবে। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তান আমলের কালা-কানুনগুলোর বিলুপ্তি ঘটিয়ে সত্যিকারের জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তা আজও হয়নি।

১৯৭৪ সালের ৫ জুলাই জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে এম এন লারমা বলেছিলেন 'মানুষকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। সেটা যদি দিতে না পারেন, তাহলে বলব আপনারা অত্যাচারী সরকার, গণবিরোধী সরকার। আপনারা যদি সরকার হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে জনসাধারণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে নাই।'

যে বাংলাদেশ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নিপীড়ন ও অন্যায় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, সেই বাঙালি শাসকগোষ্ঠী আজ গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে এক কলমের খোঁচাতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তথা এদেশের ৫০ টির অধিক জাতির জাতীয় অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধেই এম এন লারমা একাই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রাজনৈতিকভাবে অসচেতন ও সামন্তবাদে নিদ্রামগ্ন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণকে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগরিত করে এবং রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে যে সংগ্রাম তিনি শুরু করেছিলেন, যে মুক্তির অগ্নিমন্ত্র নিয়ে জুম্ম জনপদে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ১০ নভেম্বর ১৯৮৩-তে ঘাতকেরা তার জীবন প্রদীপ কেড়ে নিলেও তার সেই সংগ্রামকে শেষ করে দিতে পারেনি।

আমরা অধিকার চাই, আমরা মুক্তি চাই, সমাজ জীবনে আমরা পরিবর্তন আনতে চাই। সমাজে নারীর মর্যাদা ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে, সমাজে অবহেলিত খেটে খাওয়া শ্রমিক মজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে, এম এন লারমার আদর্শকে বুকে ধারণ করে এদেশের একটা তরুণ প্রজন্মকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। জুম জনপদের প্রতিটা সংগ্রামে, এদেশের মেহনতী মানুষের অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রতিটা প্রতিরোধ ও আত্মবলিদানে এম এন লারমা ধ্রুব তারার মতো পথপ্রদর্শক হয়ে আজীবন বেঁচে থাকবেন।

'আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দপুরুষ—কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।'

৩১ অক্টোবর ১৯৭২ 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন' সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবের উপর গণপরিষদে প্রদত্ত এম এন লারমার ভাষণের অংশবিশেষ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সংগ্রামও ন্যায়সঙ্গত

অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল

আমি প্রথমেই ঢাকায় গতকাল থেকে শুরু হয়ে আজকে যে সমাবেশ চলছে তার সাথে সংহতি ঘোষণা করছি, ঢাকায় থাকলে আমিও সেখানে থাকতাম। আর আজকে এখানে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন, তার সাথেও সংহতি প্রকাশ করছি।

আমি প্রথমেই বলি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শরণার্থী আসা শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে। কিন্তু তখন ততটা হয়নি, প্রধানত হয়েছে যখন কাপ্তাই বাঁধ তৈরি হলো। সে সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আবাদযোগ্য ভূমি তার ৪০ শতাংশ পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। আটটা উপজেলা বলি আমরা, আপনাদের আটটা ব্লকের সমান জায়গা পানির নীচে তলিয়ে গেছে, রাজার বাড়িও পানির নীচে তলিয়ে গেছে এবং সেখান থেকে এক লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ওখান থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে, সে বিদ্যুতের এক কণা পরিমাণও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ভোগ করতে পারেনি। যে এক লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হলেন, সেই এক লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে ৪০ হাজার মানুষ দেশ ত্যাগ করে ভারতে এসেছেন। সেটা হচ্ছে ষাটের দশকের গোড়ার কথা। ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪- এই সময়ের কথা।

> “পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ তারা কী করবে? জীবন বাঁচানোর জন্য তারা সেদিন প্রতিরোধে নেমেছে এবং নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য প্রতিরোধ, নিজের আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য প্রতিরোধ ন্যায়সঙ্গত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের যুদ্ধও ন্যায়সঙ্গত।”

সেই মানুষগুলো যারা দেশ ত্যাগ করেছেন, তারা উত্তর-পূর্ব ভারতের দু-তিনটা রাজ্য ঘুরতে ঘুরতে, পায়ে হেঁটে, অনেকে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছেন অরুণাচল রাজ্যে। এবং আপনারা যদি ১৯৬১-৬৪ থেকে হিসাব করেন, তাহলে আজকে কত বছর, প্রায় ৭০ বছর, এত বছর পরেও সেই মানুষগুলো এখনো ভারতের নাগরিকত্ব পাননি। আসার পথে তারা অনেকেই মারা গেছেন এবং এখানে এসে তারা আশ্রয় পেয়েছেন, কিন্তু তারা স্টেটলেস সিটিজেন (রাষ্ট্রহীন নাগরিক)। সেই ৪০ হাজার মানুষের সংখ্যা এখন এক লক্ষের বেশি হয়ে গেছে। মানুষ কী দুর্ভোগে রয়েছেন!

কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরা তো বাংলাদেশের মানুষ, কিন্তু বাংলাদেশ তাদের কথা ভুলে গেছে। যেমন এই ঘরে আপনারা অনেকেই আছেন, যারা বাংলাদেশের মানুষ, যারা সাম্প্রদায়িক দেশ বিভাগের কারণে বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে এদেশে এসেছেন। যে মাটিতে আপনাদের নাড়ি পোতা, সেই মাটি ছেড়ে এসেছেন। আপনাদের কথাও বাংলাদেশ ভুলে গেছে। আমি খুব কষ্টের সাথে কথাগুলো বলছি। কারণ ‘দেশভাগ’ বাংলাদেশে কোনো আলোচ্য বিষয় নয়। এমনকি যে একাডেমিক চর্চা হয়, সেই একাডেমিক চর্চাতেও ‘পার্টিশান’ আলোচ্য বিষয় নয়। এমনকি কবিতা, গল্প, সাহিত্যের মধ্যেও খুবই সামান্য তার রিফ্লেকশান। কিছু আছে, যারা এদেশ থেকে বাংলাদেশে গেছেন, যেমন হাসান আজিজুল হক কিংবা আনিসুজ্জান, তাঁদের লেখায় কিছু পাবেন। এছাড়া তেমন কোনো রিফ্লেকশান আমরা সাহিত্যেও পাই না।

এই যে দুর্ভাগ্য, এই যে নাড়িছেঁড়া মানুষগুলো আসেন এখানে, এবং ওখানে শুধু চাকমারা না, তার আগে ময়মনসিংহে, ওখানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গভর্ণর ছিলেন মোনায়েম খান, মোনায়েম খানের নিজের জেলা ময়মনসিংহ, এই ময়মনসিংহেরই সীমান্তবর্তী গারো, হাজং- এনারা থাকেন, সেইখানে একেবারে মুসলিমলীগের গুন্ডা, তার সাথে সেনাবাহিনী নামিয়ে সেখান থেকে হাজংদেরকে এবং

গারোদেরকে উৎখাত করা হয়েছিল। হাজংরা ছিলেন হিন্দু, গারোরা ছিলেন খ্রিশ্চিয়ান বেশির ভাগ। সেই গারো খ্রিশ্চিয়ানরা দেশান্তরিত হওয়ার পরে আন্তর্জাতিকভাবে খ্রিশ্চিয়ানরা সংগঠিত হয়েছিল। পরে পাকিস্তান সরকার ওদেরকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করে। বর্ডারের কাছে মাইক লাগিয়ে আহ্বান করা হয়, আপনারা আসুন বলে। হাজংরা হিন্দু ছিলেন, তারা ফিরতে পারেননি এবং ওখান থেকে মেঘালয়ের তুরা, ওখান থেকে যেয়ে তারা অরুণাচলে আশ্রয় নিলেন। তারাও এখনো নাগরিকত্ব পাননি। এই হচ্ছে এই রিফিউজিদের অবস্থা।

বাংলাদেশ থেকে তারপরেও আবার রিফিউজি এসেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন সংঘাত শুরু হয়েছে। তখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চাপে সেখান থেকে প্রায় এক লক্ষ মানুষ এখানে ভারতে এসেছে রিফিউজি হিসেবে। মূলত চাকমা এবং অন্যান্য জাতির মানুষ। এবং তাদের মধ্য থেকে ৬৫ হাজার মানুষ ফিরে গেছে। বাকীরা ফিরে যেতে পারেননি। কিন্তু যে ৬৫ হাজার ফিরে গেছেন, সেই ৬৫ হাজার মানুষকে কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে, লিখিত চুক্তি মোতাবেক তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে পুনর্বাসন করার কথা ছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে গৌতম দা বললেন, ঊষাতন দাও সেটা একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে, এই ৬৫ হাজার মানুষ তাদের নিজের বাড়িঘরে জায়গা-জমিতে ফিরে যেতে পারেননি। এটাতো একটি দিক।

আরেকটা দিক হচ্ছে, এই যে যুদ্ধের ২০ বছর, এই ২০ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেতরে যে আদিবাসীরা ছিলেন, এই আদিবাসীদের মধ্যে অনেক মানুষ যারা ছিলেন তারা তো নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। যেমন এক কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে এসেছিলেন, ভারত সরকার জায়গা দিয়েছিলেন, তেমনি আবার প্রায় ৪ কোটি মানুষ দেশের ভেতরে উদ্বাস্তু ছিলেন। আমি নিজে একজন উদ্বাস্তু পরিবারের সদস্য ছিলাম। তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় এক লক্ষ মানুষ শরণার্থী হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দেশের ভেতরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেতরে প্রায় ৪ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ছিলেন। সেই উদ্বাস্তুরা, তারাও কিন্তু পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুযায়ী নিজের জমিতে, নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা। সেটার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সেটা কিন্তু রাষ্ট্র করেনি।

পার্বত্যচুক্তি করেছে এই সরকার, সেই সরকার এখনো ক্ষমতায় আছে, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর চুক্তি হয়েছে, ২৫ বছর পার হয়ে গেছে, ওই মানুষগুলো এখনো নিজের বাড়িঘরে ফিরে যেতে পারেনি। তাদের সংখ্যা ৯২,৫০০+ পরিবার। বাংলাদেশে একটা পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.৫। তাহলে ৯২,৫০০-কে ৫.৫ দিয়ে গুণ করে দেখেন, কত মানুষ হয়। আর তার সাথে শরণার্থী যারা ফিরে এসেছেন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ তো তাদের নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যেতে পারেননি। এই যদি হয় বাস্তবতা, চুক্তি করার ২৫ বছর পরে, তারপরে মানুষের জীবনে আর কী বাকী থাকে!

এই কথাগুলো বলছি, আমার নাম শুনে বুঝেছেন আমি একজন বাঙালি এবং বাঙালি হিসেবে আমি গর্বিত। বাঙালি জাতি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম জাতি। বাঙালি হিসেবে আমি খুবই গর্বিত। কিন্তু আমি মনেকরি, বাঙালির যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, ন্যায্য অধিকার আছে, পাকিস্তানীরা সেই অধিকার লংঘন করেছিল বলেই বাংলাদেশের বাঙালি সেদিন যুদ্ধে নেমেছে এবং পাকিস্তানের মত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার বাঙালিসহ ভারতের সমস্ত জাতির মানুষ আমাদেরকে সমর্থন করেছে।

কিন্তু যেভাবে আমাদের সংগ্রাম ন্যায্য ছিলো, আমি মনেকরি, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খুমী, খিয়াং, বমসহ যে জাতিগুলো বাস করে তাদের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামও অত্যন্ত ন্যায্য সংগ্রাম। কারণ আমাদের বাঙালিদের সংগ্রাম যদি ন্যায্য হয়ে থাকে, যে কারণে ন্যায্য, কারণ আমরা আমাদের পরিচয়ের স্বীকৃতি চেয়েছি, আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা চেয়েছি, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষও তার পরিচয়ের স্বীকৃতি চায়, তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা চায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের অধিকারের সংগ্রামও অত্যন্ত ন্যায্য সংগ্রাম। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র তাদেরকে বলেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী। একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। আমি নিজে এটা নিয়ে গবেষণা করেছি। আমি আমার পিএইচডি করেছি এটা নিয়ে। আমি সমস্ত ডকুমেন্ট পড়ার চেষ্টা করেছি এবং সেনাবাহিনীর কাছে যে ডকুমেন্ট আছে সেগুলোও সার্চ করার চেষ্টা করেছি। আমার বন্ধুরা সেনাবাহিনীতে আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কখনো বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি। তারা কী চেয়েছে? তারা চেয়েছে যে, সংবিধানের মধ্যে তাদেরকে একটু জায়গা দেয়া হোক। যখন বাংলাদেশের সংবিধানও, খুবই দুর্ভাগ্যজনক, যখন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সময়ে যে সংবিধান গ্রহণ করা হলো, সেই সংবিধানেও তাদেরকে জায়গা দেওয়া হলো না। বলা হয়েছে, এদেশের জনগণ জাতিতে বাঙালি। সবাই বাঙালি? তাহলে ঊষাতন তালুকদার বসে আছেন, উনিও বাঙালি? বাংলাদেশ এখন কিন্তু ৫০টা আদিবাসী জাতিকে, আদিবাসী নামে নয়, অন্য নামে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' নামে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার মানে, বাঙালি ছাড়াও আরও ৫০টা জাতি আছে। এই ৫০টা জাতিকে বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সেই জাতিগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য যে কমিটি করেছিলো, সেই কমিটির প্রধান ছিলাম আমি। আমি এবং আমার টিম ৭৮টা জাতিকে চিহ্নিত করেছি।

তার থেকে বাংলাদেশ সরকার ৫০টা জাতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার মানে, যে স্বীকৃতিটা তারা ৫২ বছর পরে এসে দিলো বা ৫০ বছর পরে এসে দিলো, সেই স্বীকৃতিটা যদি ৭২-এ দেয়া হতো, তাহলে তো যুদ্ধের দরকার হতো না। এবং সরকার কী করেছে? সমতল থেকে ৪ থেকে ৫ লক্ষ বাঙালি মুসলমানকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসিয়ে দিলো এবং সেখানে তারা রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর ছত্রছায়ায় অন্যদের উপর হামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন, জমিজমা দখল করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ তারা কী করবে? জীবন বাঁচানোর জন্য তারা সেদিন প্রতিরোধে নেমেছে এবং নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য প্রতিরোধ, নিজের আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য প্রতিরোধ ন্যায়সঙ্গত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের যুদ্ধও ন্যায়সঙ্গত। এটা রাষ্ট্রীয় পলিসির ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় পলিসি যদি ডাইভারসিটিকে স্বীকার করে, রাষ্ট্র যদি প্লুরালিটিকে স্বীকার করে, তারা যদি বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে, এদেশে একটা জাতির মানুষ না, এদেশে বহু জাতির মানুষ আছে, একটা ধর্মের মানুষ না বহু ধর্মের মানুষ আছে, যেমন মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আরও অন্যান্য মানুষ আছে, বাঙালির পাশাপাশি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খুমী, খিয়াং, সাঁওতাল, ওঁরাও, গারো, মনিপুরী, কত জাতি আছে, এই সকলের স্বীকৃতিটা যদি সংবিধান দেয়, তাহলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বন্ধুরা, তারা চেয়েছেন, সংবিধানের মধ্যে একটু জায়গা দিন। তারা বলেছে আমাদেরকে একটু আশ্রয় দিন। তারা কী চান? তারা চান, সংবিধানে দুই ধরনের অন্তর্ভুক্তি। একটা অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে, বাঙালি ছাড়াও এদেশে আরো অনেক জাতি আছে- এই কথাটা লেখা হোক এবং তার একটা তালিকা, একটা সিডিউল, আপনাদের যেমন আছে এসটি সিডিউল, তারা চান এরকম একটা সিডিউল করে সবাইকে যুক্ত করে নেওয়া হোক। এই সিডিউল তো ছিলো। এমনকি পাকিস্তানের ৫৬ সালের সংবিধানেও এই সিডিউল ছিলো। সেই সিডিউল ভারতের সংবিধানে তুলে ধরা হয়েছে। আপনাদের এখানে এসটি আছে, এসসি আছে, ওযিসি আছে।

বাংলাদেশে কিছুই নাই। সেখানে কোনো এসটি নাই, এসসি নাই, ওযিসি নাই, তো বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের কি নাগরিক অধিকার নাই? তাদের কি সমান তালে এগিয়ে আসার সুযোগ থাকা উচিত নয়? তাদের জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নাই? তাদের জন্য কোটার দরকার নাই স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, চাকরিতে? নিশ্চয়ই দরকার আছে। কারণ পিছিয়ে যারা পড়ে আছে তাদেরকে সমানতালে এগিয়ে আসার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করতে হবে। রাষ্ট্র যদি এগুলো না করে, রাষ্ট্র যদি ডাইভারসিটি, প্লুরালিটিকে ডিনাই করে, তাহলে সেখানে মানুষের যে সমঅধিকার, সেই সমঅধিকার লংঘিত হয়। এদিক থেকে আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা কর্তৃত্ববাদী শাসন চলছে, এটা শুধু জাতিগত কর্তৃত্ব না, তার সাথে যে অভিযোগটা উঠেছে, খুবই সত্য অভিযোগ, সেখানে আসলে ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে।

খুবই দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, যারা এক সময় অসাম্প্রদায়িকতার সংগ্রাম করে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িকতা বিকাশে কাজ করেছেন তারাই আজকে দেখা যাচ্ছে যে, তারাই আজ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পৃষ্টপোষকতা করছেন। বাংলাদেশ কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার পথে এগুলে সামনে এগুতে পারবে না। ভারতের জন্যও বিপদের কথা বলছি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দখলে চলে যায় তাহলে যেটা হবে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে অশান্তি ছিলো ভারতে, সেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অশান্তিকে উস্কে দেয়ার মত পরিস্থিতি আবার তৈরি হবে। এই বিষয়টা আমার মনে হয় বিবেচনায় আনা উচিত। কাজেই আমি মনে করি, আসলে ভারত-বাংলাদেশের মানুষের ঐক্য চিরজীবী হওয়া দরকার এবং আপনারা, বিশেষ করে যাদের পূর্বপুরুষের নাড়ি বাংলাদেশে পোতা এবং এদেশের মানুষ যেখানেই জন্ম হোক, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাদের আমাদের পাশে, বিপদের দিনে আপনারা যেমন আগে এসে দাঁড়িয়েছেন, এখনো এসে দাঁড়াবেন।

বাংলাদেশ থেকে কিন্তু বহু মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, শুধু ভারতে আসছেন না, সারা পৃথিবীতে যাচ্ছেন এবং কেন যাচ্ছেন? শুধু কাজের সন্ধানে যাচ্ছেন না, প্রধানত যেজন্য সংখ্যালঘুরা যাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে নিরাপত্তার অভাব। এটা বুঝতে হবে। দেশের খারাপ কথা বলতে ভালো লাগে না, কষ্টবোধ হয়। কিন্তু আমরা যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, সেই স্বপ্নের মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে দেখতে চাই।

[গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ বন্ধ কর' শ্লোগানকে সামনে রেখে ক্যাম্পেইন অ্যাগেনস্ট অ্যাট্রোসিটিস অন মাইনরিটি ইন বাংলাদেশ (ক্যাম্ব) ও অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের যৌথ উদ্যোগে 'মানবাধিকার লংঘন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন' বিষয়ে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল যে বক্তব্য রাখেন তা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করা হলো।]

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ‘ভবঘুরে’ জিজ্ঞাসা

পাভেল পার্থ

‘ভবঘুরে’ জীবন কী? কে ‘ভবঘুরে’? এমন প্রশ্নগুলি বেশ জটিল। কারণ এসব প্রশ্ন একইসাথে মনের ভেতর দার্শনিকতাকে উচ্চকিত করে আবার একধরণের সামাজিক বঞ্চনা ও ‘অস্পৃশ্যতাকে’ হাজির করে। তো চলতি আলাপখানি ভবঘুরেদের বিষয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কিছু রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা নিয়ে। এমনও হয়তো হতে পারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রে রাজনৈতিকভাবে ভবঘুরেদের নিয়ে রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মূলত কী বলেছিলেন সেই আলাপে হাজির হওয়ার আগে ‘ভবঘুরে’ বিষয়ে কিছু সাধারণ চিন্তা ভাগ করা জরুরি।

২০২২ সনের সেপ্টেম্বরে এক সকালে ঢাকার বকশীবাজার ও জুরাইন এলাকা থেকে দুটি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এদের একজন অজ্ঞাত ছিলেন এবং আরেকজনের নাম জানা যায়। গণমাধ্যমে এ বিষয়ে পরিবেশিত সংবাদটিতে উভয়কেই ‘ভবঘুরে’ হিসেবে সম্বোধন করা হয়।[১] জয়পুরের পাঁচবিবি রেলস্টেশনটি বেশ প্রাচীন। ব্রিটিশ উপনিবেশকালে নির্মিত ক্ষয়িষ্ণু লালদালানের এই স্টেশনের একটি খবর পাঠ করা যাক। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরটিতে বলা হয়, এখনো স্টেশনটি আধুনিক ডিজিটাল নয়, মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিতে টিকেট কাটা হয়। আরেকটি অভিযোগ ছিল খবরটিতে, যাত্রীরা স্টেশনে বসতে পারেন না কারণ সেই জায়গা দখল করে রাখে ভবঘুরেরা।[২] ভবঘুরেদের নিয়ে এমন সংবাদ ও সংবাদভাষ্য বরাবরই আমাদের চিন্তায় ভবঘুরেদের এক নেতিবাচক এবং অচ্ছুত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে ভবঘুরে নামে অনেক মানুষের ক্ষেত্রে তাদের কাজ ও মহিমার জন্য এই নামপরিচয়টি কিন্তু একেবারেই ভিন্ন আরেক সামাজিক দ্যোতনা তৈরি করে।

ঘুরে বেড়ানো যাদের শখ, বা যারা পর্যটক তারা অনেকেই নিজেদের ‘ভবঘুরে’ মনে করেন। তারা তাদের ভবঘুরে জীবন নিয়ে বই লিখেন, সিনেমা বানান। ভবঘুরে জীবনের কারণে সামাজিকভাবে প্রশংসিত ও সম্মানিত হন। দুনিয়াকাঁপানো পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস ছিলেন হাওরের সন্তান। হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ের বিদ্যাভূষণপাড়ার মানুষ। মূলত সাইকেলে ঘুরে দেখেছেন বিশ্ব। লিখেছেন ৩০ এর বেশি ভ্রমণবিষয়ক বই। ‘ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ’ নিয়ে একটি বই তাছে তাঁর। অস্ট্রিয়া থেকে আন্দালুসিয়া ভ্রমণের ওপর ‘ভবঘুরের দিনপঞ্জি’ নামে বই লিখেছেন অমৃতা পারভেজ।[৩] যশোধরা রায়চৌধুরীরও লেখালেখি আছে ‘পাগল ও ভবঘুরের ভাইরাস’ নামে।[৪] তো এই ‘ভবঘুরেরা’ নিশ্চয়ই শহরের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো ভাসমান ‘ভবঘুরে’ প্রান্তজন নন। অবশ্য এ নিয়ে দার্শনিক ও রাজনৈতিক তর্ক আছে। কারণ যারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়ে নিজেদের ‘ভবঘুরে’ পরিচয়কে মহান করে তুলছেন আবার যারা রাস্তায় ‘ভবঘুরে’ পরিচয়ে সমাজে বঞ্চিত অস্পৃশ্য প্রান্তজন হয়ে থাকছেন তাদের সকলেরই নিজস্ব দেখার দুনিয়া আছে। দর্শন, চিন্তাজগত ও জীবনের পরিধি আছে। চলতি আলাপ এই পরিসরে যাচ্ছে না। বিশেষ করে শহরের রাস্তাঘাটে, ফুটপাতে, রেল ও বাসস্টেশনে, লঞ্চঘাটে, বস্তি বা নগরের নিম্নআয়ের মানুষের বসতিতে বহু মানুষ আছেন যারা চেয়েচিন্তে খান, ভিক্ষা করেন কিংবা ‘অমানবিক’ জীবনযাপন করে। অবশ্য রাজশাহীতে সেচের পানির অভাবে অভিমানে আত্মহত্যা করা দুই সাঁওতাল কৃষক বা আজ জলবায়ু সংকটের কারণে সাতক্ষীরা থেকে প্রতিদিন উচ্ছেদ হয়ে ইটের ভাটায় চলে যাওয়া কৃষকের জীবনও কতটুকু মানবিক কী অমানবিক এ প্রশ্ন ওঠতে পারে। এমনকি এভাবেও ভবঘুরেদের ব্যাখা করা সম্ভব নয়, যে, যারা রাস্তায় ঘুরেন, স্থায়ী ঠিকানা নেই, অপরিচ্ছন্ন থাকেন কিংবা ‘উদ্ভট’ জীবনযাপন করেন তারাই ভবঘুরে। নয়াউদারবাদী দুনিয়ায় অস্ত্রবাণিজ্যকে জায়েজ করার মত উদ্ভট আর কী হতে পারে?

কাদের জন্য লারমার প্রশ্ন?

তো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কোন ভবঘুরেদের জন্য প্রশ্ন তুলেছিলেন? পর্যটক ও লেখক রামনাথ বিশ্বাসের মতো ‘ভবঘুরেদের’ জন্য নাকি বেঘোরে রাস্তায় মরে যাওয়া ‘অজ্ঞাত’ ভবঘুরেদের জন্য? লারমা প্রশ্ন তুলেছিলেন জীর্ণ ভংগুর কিছু মানুষদের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র যাদের ‘ভবঘুরে’ হিসেবে চিহ্নিত করে। লারমা এই বঞ্চিত ভবঘুরে মানুষদের সংখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র ভবঘুরেদের জন্য কী দায়িত্ব নেবে তা প্রশ্ন করেছিলেন। লারমার সময়ে রাষ্ট্র ভবঘুরেদের সংখ্যা না জানতে পারলেও এখন কিছুটা হলেও জানা সম্ভব। জনশুমারিতে দেশে বস্তিতে থাকা মানুষের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৮ লাখ ৪৮৬ জন এবং ভাসমান মানুষের সংখ্যা ২২

১. দেখুন: দুই ভবঘুরের মরদেহ উদ্ধার, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২

২. দেখুন: মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিতেই টিকিট বিক্রি হচ্ছে পাঁচবিবি রেলস্টেশনে, ২১/৯/২০২২,

৩. দেখুন: অমৃতা পারভেজ, ভবঘুরের দিনপঞ্জি : অষ্ট্রিয়া থেকে আন্দালুসিয়া, আদর্শ প্রকাশনী, বাংলাদেশ

৪.https://www.parabaas.com/shakti/articles/pYashodhara.shtml

হাজার ১৮৫ জন। এর ভেতর ঢাকায় সবচেয়ে বেশি মানুষ বস্তিতে বসবাস করেন এবং এদের সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ ৮৪ হাজার ৪৯৬ জন এবং ভাসমান মানুষের সংখ্যা ৯ হাজার ৪৭০ জন।

তবে এখনো এই ভাসমান ভবঘুরেদের বরাবরই 'অপরাধী' এবং 'দোষী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিশেষ করে মূলধারার মনোজগতে এই ভবঘুরেরা প্রশ্নহীনভাবেই অস্পৃশ্য এবং অপরাধী। গণমাধ্যম জানাচ্ছে, রাজধানী ঢাকায় বেশি অপরাধে জড়াচ্ছেন ভাসমান মানুষেরা, ভবঘুরে এবং ভাসমান মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। ২০২২ সনের জুনে রাজধানীতে ২১টি খুনের ঘটনায় আটটির সঙ্গে ভাসমান মানুষের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে আইনশৃংখলা বাহিনী। গণমাধ্যমকে পুলিশ জানিয়েছে, ভাসমান ভবঘুরে মানুষেরা কোনো বৈশ্বিক কারণ বা টাকা পয়সার সমস্যা কি লেনদেনের কারণে খুনোখুনি করে না। বরং তাদের ভেতর একটি সমাজ ও আন্তরিকতা আছে, গাঁজা খেয়ে তাদের মান-অভিমান বেশি তৈরি হয় এবং দুঃখ-কষ্ট বেশি থাকে। একটা সময় সামান্য কোনো কারণে দ্বন্দ্ব হলে মান-অভিমান কিংবা দুঃখ-কষ্টে হাতের কাছে যা পায় তা দিয়েই আঘাত করে এমনকি খুন করে ফেলে।[৫] ঢাকার বিমানবন্দর, বিশ্বরোড, কদমতলি, ডেমরা, যাত্রাবাড়ী, সদরঘাট, তেজগাঁও, কারওয়ান বাজার, কমলাপুর রেলস্টেশন, হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ ও খিলগাঁও এই ১৫টি এলাকাকে ভাসমান মানুষের অপরাধ জোন হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ।

ভবঘুরে কারা?

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেয়া দারিদ্র্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী দরিদ্র বলতে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থাকে বোঝায়।[৬] গরিব মানুষ বা দরিদ্র বলতে আমরা অর্থনীতি, সামাজিক ও কিছু রাজনৈতিক মানদন্ড ও বিশ্লেষণ দাঁড় করাই। কিন্তু ভবঘুরে কেবল অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত কোনো অবস্থা নয়। ব্যক্তির এই দশা বা পরিস্থিতি নানা কারণেই হতে পারে। তাহলে রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞায়নে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি কারা? 'ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১' অনুযায়ী ভবঘুরে হচ্ছেন এমন কোনো ব্যক্তি যার বসবাসের বা রাত্রিযাপনের মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা নাই অথবা যিনি কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত অযথা রাস্তায় ঘোরাফিরা করে জনসাধারণকে বিরক্ত করেন অথবা যিনি নিজে বা কারো প্ররোচনায় ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হন তিনিই ভবঘুরে। তবে কোন ব্যক্তি দাতব্য, ধর্মীয় বা জনহিতকর, কোন কাজের উদ্দেশ্যে মানে খাদ্য বা অন্য কোন প্রকার দান সংগ্রহ করলে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বা কাজে তা ব্যবহার করলে তিনি ভবঘুরে সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবেন না। উল্লিখিত আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী নিরাশ্রয় ব্যক্তির অর্থ এমন কোন ব্যক্তির যার বসবাসের বা রাত্রি যাপন করার মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা এবং ভরণপোষণের জন্য নিজস্ব কোন সংস্থান নাই এবং যিনি অসহায়ভাবে শহর বা গ্রামে ভাসমান অবস্থায় জীবনযাপন করেন এবং সরকার কর্তৃক সময়সময় প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা ও সাহায্য লাভ করেন না।

ভবঘুরেদের নিয়ে লারমার জিজ্ঞাসা

১৯৭৪ সনে তৎকালীন সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জাতীয় সংসদে 'ভবঘুরেদের' বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশে ভবঘুরেদের পরিসংখ্যান জানতে চান এবং ভবঘুরেদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য কোনো ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কীনা সেটিও জানতে চান। নিচে আমরা দেখার চেষ্টা করবো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কী বলেছিলেন[৭]:

শ্রী লারমা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে বলবেন কি যে, বাংলাদেশে ভবঘুরের সংখ্যা কত?

জনাব আব্দুল মান্নান : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, ভবঘুরের সংখ্যা মোট কত এই ধরণের কোন সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

শ্রী লারমা : মাননীয় মন্ত্রী দয়া করে বলবেন কি, বাংলাদেশের ভবঘুরের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

জনাব মান্নান : এখন পর্যন্ত করা হয়নি, ভবিষ্যতে ব্যবস্থা করা হবে কিনা বিবেচনা করা হবে।

ভবঘুরে ও রাষ্ট্রের মনোযোগ

দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ১৯৪৩ সনে ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ ব্যক্তিগণকে সরকারি তত্ত্বাবধানে রেখে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উপায়ে সমাজে পুনবার্সিত করার লক্ষ্যে

৫. দেখুন: অপরাধে জড়াচ্ছে ভবঘুরেরা, দৈনিক বাংলাদেশের খবর, ১৩ আগস্ট ২০২২

৬. দেখুন: নিরাশ্রয়দের পুনর্বাসনে আইন যা বলে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জুন ২০২২, ক্লিক করুন: https://www.ittefaq.com.bd/601280

৭. দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতক, বিষয়-ভবঘুরে, খন্ড ২, সংখ্যা-৩০, ১৩ জুলাই ১৯৭৪

ভবঘুরে আইন প্রর্বতন করা হয়। অবিভক্ত ব্রিটিশ উপনিবেশিক ভারতে ১৯৪২ সনে কলকাতায় প্রথম ভবঘুরে নিবাস স্থাপিত হয়। দেশভাগের পর ১৯৪৭ সনে চাঁদপুরে এবং ১৯৬১ সনে ময়মনসিংহের ত্রিশালে ও গাজীপুরের পূবাইলে ভবঘুরে নিবাস স্থাপিত হয়। দেশ স্বাধীনের পর ভবঘুরেদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় ঢাকার মিরপুরে, মানিকগঞ্জের বেতিলায়, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে এবং গাজীপুরের কাশিমপুরে আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পূববর্তী ভবঘুরে আইন কার্যকর না হওয়ায় ২০১১ সনে প্রতর্বন হয় 'ভবঘুরে ও নিরাশ্রম ব্যক্তি (পুনবার্সন) আইন' এবং ২০১৫ সনে প্রণীত হয় 'ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা'। মানুষ কেন নিরাশ্রয় ও ভবঘুরে হয়? সমাজসেবা অধিদপ্তর ভবঘুরে ও ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যার পিছনে বেশকিছু কারণ চিহ্নিত করেছে। চরম দারিদ্র্যতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গৃহ ও ভূমিহীনতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মুদ্রাস্ফীতি, ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় বিষয়গুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮]

সরকারি ৬টি ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রে মোট ১৯০০ আসন আছে। 'ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১' অনুযায়ী আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের বিশেষ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ভবঘুরে ঘোষণা করে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পাঠায় সমাজসেবা অধিদপ্তর। সরকারি পাঁচটি আশ্রয়কেন্দ্রে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় নিরাশ্রিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার তথ্য গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভবঘুরে কার্যক্রমের উপপরিচালক। সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ভবঘুরেদের জন্য গাজীপুরে আরেকটি নতুন আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তরকে।[৯]

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের শুরুতেই ভবঘুরেদের নিয়ে জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেছেন। বিষয়টি রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র, সমাজকাঠামো, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিকতার সাথে জড়িত। কোনো দেশে রামনাথ বিশ্বাসদের মতো ভবঘুরে তৈরি হয়ে ওঠা সেই দেশের সমাজরূপান্তরের দারুণ সুস্থতা জানান দিতে পারে। কিন্তু কোনো দেশে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উত্থাপিত ভবঘুরে তৈরি হওয়া সামগ্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং চরম রুগ্‌ণ পরিস্থিতিকে সামনে আনে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সমাজের সকল শ্রেণি-বর্গকেই তার সংসদীয় বক্তৃতায় যতটুকু সময় ও সুযোগ পেয়েছেন টানতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রতিবার পাঠ করি আর প্রতিবার নতুন নতুন ভুবন সামনে হাজির হয়। একটি সমাজ ততোখানি এগিয়ে যাবে, হয়তো যখন সে সমাজে ভবঘুরেদের মতো কেউ 'অজ্ঞাত লাশ' হয়ে ওঠবে না। নিরাশ্রিত ও ভাসমান থাকবে না। মূলধারার চিন্তাজগত থেকে অপরাধী ও অস্পৃশ্যতার পর্দা সরে যাবে। হয়তো মানুষ সেই সমাজে পর্যটক ও লেখক রামনাথ বিশ্বাসদের মতো সত্যিকারের 'ভবঘুরে' হয়ে ওঠবে। ১৯৭৪ সনে সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ভবঘুরেদের বিষয়ে জানতে চেয়ে সমাজের সকল মানুষের জন্য এক ন্যায্য ব্যবস্থার কথা উচ্চারণ করেছিলেন। মানবেন্দ্র'র এসব ভাষ্য ও প্রশ্ন নিয়ে তর্ক হতে পারে, বাহাস হতে পারে। আসুন সেসব জড়ো করি, বিস্তৃত করি, উসকে দেই।

লেখক ও গবেষক। ই-মেইল: *animistbangla@gmail.com*

৮. দেখুন: সমাজেসেবা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট। লিংকটিতে ক্লিক করতে পারেন:
https://msw.gov.bd/site/page/e34672e0-1783-483c-bd18-a0ae2a43d903/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0

৯. দেখুন : মহামারীতে আশ্রয়কেন্দ্রে ভবঘুরে বেড়েছে 'তিনগুণ' : নতুন করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে পাঁচ মাসে দেশে ভবঘুরে মানুষ বেড়েছে প্রায় তিন গুণ, বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৫/৮/২০২০

এম এন লারমার গণ জিজ্ঞাসা ও সর্বাঙ্গ সুন্দর দেশের ভাবনা: কেন এখনও প্রাসঙ্গিক?

সতেজ চাকমা

'গণ' শব্দটির অর্থবোধক ব্যাপকতা বহুদূর বিস্তৃত। এই গণ পদটির বহুল ব্যবহৃত প্রতিশব্দ হল জনগণ। রাজনৈতিক অঙ্গনের সকল ব্যক্তি প্রায় সময় বলে থাকেন তাদের যত ত্যাগ, যত কাজ, যত ভাবনা সমস্ত কিছুই জনগণকে কেন্দ্র করেই। সাংবাদিক সমাজও বলে থাকেন তাদেরও লেখালেখি জনগণের জন্য এবং অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করবার নিমিত্তে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে মেরুকরণ দৃশ্যমান তার প্রধান দু'টি প্রতিপক্ষ আওয়ামীলীগ ও বিএনপি'র যুক্তি ও বক্তৃতাবাজি (Rhetoric) শুনলে বোঝা যায় যে দলগুলো বলার চেষ্টা করে তাঁদের সমস্ত কর্মসূচি 'জনগণের জন্য'। আওয়ামীলীগ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চায় বাংলাদেশের জনগণের জন্য আর বিএনপিও আওয়ামীলীগকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে চায় 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য'। প্রশ্ন হল- জনগণের আসল বন্ধু কারা? যাইহোক, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও কিঞ্চিত অস্থিরতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ বলছে তারা 'গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার' সংগ্রাম করছে আবার প্রতিপক্ষ বিএনপি বলছে 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের' সংগ্রাম করছে তারা। কাজেই এই যে গণতন্ত্রের খেলায় অর্থাৎ, গণতন্ত্র অব্যাহত রাখা বা পুনরুদ্ধারের যে সংগ্রাম তাতে আসলে বার্গারের মাঝখানে চাপা পড়ে থাকা মাংস টুকরার মত হাঁপিয়ে উঠে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে জনগণ। কথায় আছে, রাজা আসে রাজা যায়। কিন্তু জনগণের দোহায় দিয়ে যারা ক্ষমতার মসনদে বসে বা মসনদ তছনছ করার ফন্দি আঁটে আসলে সেখানে 'জনগণ' বলতে যাদের বোঝানো হয়, তাদের ভাগ্য কতটা পরিবর্তন হয়। কিন্তু তার আগেও জরুরি প্রশ্ন হল মানুষের 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার' নিশ্চিত করবার মহান শপথ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যে দেশ স্বাধীন করেছিল সেখানে 'জনগণ' বলতে যাদেরকে বোঝানো হয়েছে তার অর্থবোধকতা, পরিধি বা বিস্তৃতি আসলে কতটুকু?

এর উত্তর খুঁজতে গেলে যেতে হয় স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময়ে করা তৎকালীন জনপ্রতিনিধিদের গণপরিষদ বিতর্ক এবং ১৯৭৩ সালে নবগঠিত জাতীয় সংসদের আলোচনাগুলোতে। তখন বোঝা যাবে যারা সেসময় দেশের মানুষ আগামী দিনে কীভাবে পরিচালিত হবে তার রোডম্যাপ হিসেবে সংবিধান রচনার মহান দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের বোধের মধ্যে 'জনগণ' বলতে আসলে কারা ছিল। এই প্রশ্নগুলো সামনে নিয়ে আসছি যখন দেশের দ্রব্যমূল্যের বাজার চড়া। সংবাদ মাধ্যম খুললে বোঝা যাচ্ছে, একেবারেই জনগণ বলতে যাদের বোঝানো হয় তারা আজ অসহায়। আয়ের পরিসীমার সাথে ব্যয় করার জন্য যে নিত্য পণ্যের দর তার মধ্যে বহু ফারাক। ফলে রিক্সাচালক, কুলি, মজুর, শ্রমিকসহ নিম্ন আয়ের মানুষ আজ নাজেহাল। অন্যদিকে গোটা দেশের এমনি একটা অর্থনৈতিক টানপোড়নের মধ্যে গত ১১ অক্টোবর ২০২৩, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের জন্য ২৬১ টি গাড়ি ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে সরকারের অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি[১]। এসব গাড়ি ক্রয়ে ব্যয় হবে তিনশ' একাশি কোটি আটান্ন লাখ টাকা। দেশের অর্থনৈতিক বিভাজনের এটি কেবল একটি ছোট নমুনা। এরকম ভুরি ভুরি নানা উদাহরণ টানা যাবে। মোদ্দাকথা হল ধনীরা ক্রমশ ধনী হচ্ছে এবং গরিব ক্রমশ গরিব হতে হতে প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে- তার উত্তর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায়ও পাওয়া যাবে। তবে আমার আলোচনা ইতিহাসের নিরিখে। ঐতিহাসিক কাল ধরে দেশে যারা 'জনগণ' এর দোহায় দিয়ে ক্ষমতার মসনদ দখল করছে আর শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছে এবং নানা পলিসি প্রণয়ন করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে তাঁদের ভাবনার ক্যানভাসে 'জনগণ' বলতে আসলে কারা থাকে? কারণ তারাই তো নির্ধারণ করছে কার জন্য কত টাকা দরের লাক্সারি গাড়ি ক্রয় করা হবে আর কাঁচা সবজির ভ্যানের পাশে গিয়ে গোমড়ামুখো হবে কারা!

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে পেছনে ফিরতে হবে। ১৯৭২ সাল। সদ্য স্বাধীন একটি দেশ। দেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হচ্ছে গণপরিষদে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত ৪৬৯-এর (জাতীয় পরিষদে ১৬৯ জন আর প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ জন) মধ্যে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। ৪০৩ জনের মধ্যে ৪০০ জন সদস্য ছিল আওয়ামী লীগের আর ১ জন ছিল ন্যাপের আর ২ জন ছিল নির্দলীয়। একজন বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (ন্যাপ থেকে নির্বাচিত) অপরজন পাহাড়সহ দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, সংবিধান রচনার সময় সংঘটিত গণপরিষদ বিতর্ক অনেকটা তৎকালীন সংবিধান

১. https://www.prothomalo.com/bangladesh/akir2x66cp

প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ও আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বনাম সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও এম এন লারমা এর মধ্যকার সংলাপ। এসব সংলাপগুলোতে পাহাড় থেকে নির্বাচিত সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র 'গণ' জিজ্ঞাসা বারংবার তৎকালীন জাত্যাভিমানী আইন প্রণেতাদের 'জনগণ' বিষয়ক ভাবনার জগতে যে ব্যাপ্তি তাতে করেছে বারংবার আঘাত। গণপরিষদ বিতর্কের সময় সর্বমোট ১৬৩ টি সংশোধনী প্রস্তার উত্থাপিত হয়। তার মধ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ছিল ২৫ টি সংশোধনী প্রস্তার যার একটিও পাস করেনি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ও দলের সদস্যরা[২]।

পাহাড়ের প্রান্তজনের প্রতিনিধি হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নানাভাবে তাঁর এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং আঘাত করেছেন তৎকালীন শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের চিন্তাকাঠামোতে। সেদিন ছিল ৭ এপ্রিল ১৯৭৩। নবগঠিত জাতীয় সংসদের সদস্যদের শপথ গ্রহনের পূর্বে পবিত্র কোরান থেকে সুরা ও গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করে সংসদে দিনের কর্মসূচী শুরু হল[৩]। যারা শাসক চেয়ারে ছিল তাঁদের কাছে সেটি হয়ত স্বাভাবিকই ঠেকেছে। কিন্তু সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র গণ জিজ্ঞাসার জাল সেটিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করল। তিনি দেখলেন, যে দুই ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হল সেগুলো পুরো দেশের মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে না। তাঁর প্রশ্ন- 'দেশে কেবল হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী লোক নেই। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকজনও বসবাস করেন। কাজেই কেন ত্রিপিটক ও বাইবেল থেকেও পাঠ করা হবে না?

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার এই প্রস্তাবের পক্ষে আইনমন্ত্রী আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ২ জুন ১৯৭৩ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে আবার একই বিষয়ে পুনঃদৃষ্টি আকর্ষণ করতে হচ্ছে। তবে এবার তাঁকে অনেকটা কটাক্ষ করা হল। তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর (যিনি পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর গঠিত খন্ডকার মোশতাকের মন্ত্রীসভায়ও আইনমন্ত্রী ছিলেন) মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে কটাক্ষের সুরে বলছেন– 'ত্রিপিটক পাঠ করার মত একমাত্র মাননীয় লারমা ছাড়া এখানে কেউ নাই। তিনি যদি পাঠ করতে চান তবে মাননীয় স্পীকার সাহেব পড়ার অনুমতি দেবেন। কাজেই পরিষ্কার ঘোষণার কোনো প্রশ্ন নাই'। মনোরঞ্জন বাবুর আরেক মত হল- 'হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মে কোনো প্রভেদ নাই'। এই হল তৎকালীন আইন প্রণেতাদের যুক্তি।

কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ক্ষুরধার যুক্তি 'ত্রিপিটক পাঠ করার জন্য' তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেননি। তাঁর কথা স্পষ্ট, যে দেশের মানুষের জন্য তারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসদে পলিসি প্রণয়ন করছেন, কথা বলছেন, আলোচনা করছেন সেই সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, ভাবনা, চিন্তা, চর্চা ও মনস্তত্বে সকল জনগণের প্রতিনিধিত্ব আছে কী না, সেটা নিশ্চিত করা। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার 'গণ' জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে তাই সবসময় ছিল সার্বজনীনতা। তাইতো ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে দেখা যাচ্ছে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আবারও পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে স্পীকারকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন- কেন পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করা হবে না? কারণ, সেদিন কেবল কোরান, গীতা ও ত্রিপিটক থেকে পবিত্র বাণী পাঠ করা হয়েছিল।

কেবল সকল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের প্রস্তাবনা দিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ক্ষান্ত থাকেননি। তাঁর প্রস্তাবনা ছিল দেশের সকল শ্রেণী, পেশা, বর্ণ, জাতি ও লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে। তিনি যেসময় এই প্রশ্নগুলো সংসদে তুলছেন তখন যদি বাংলাদেশকে কল্পনা করা যায় তা হবে এরকম- যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ। যুদ্ধ পীড়িত মানুষ স্বপ্নের খোঁজে ছুটছে নানা প্রান্তে। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সমস্ত ক্ষেত্রেই হা-ভাতে মানুষের হাহাকার। এমনি একটা সময়ে ১৩ জুলাই ১৯৭৪ সালে সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন– 'দেশে ভবঘুরে মানুষের সংখ্যা কত?' সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আব্দুল মান্নানের উত্তরে বোঝা যায় তিনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রশ্নের মধ্যে যে চিন্তা সেটাকে গুরুত্বই দেননি। বরং বললেন, 'এরকম সংখ্যা নির্ধারণে সরকার ভবিষ্যতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কী না তা বিবেচনা করবে।' এমনি উপক্ষিত জবাবেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'কে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব চিন্তার মধ্য দিয়ে যদি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'কে পাঠ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, তিনি রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। যে জনগণের জন্য রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা আইন প্রণয়ন করেন, নীতি-কৌশল নির্ধারণ করেন তাঁদের চিন্তা ও মনস্তত্বে সমস্ত জনের প্রতিনিধিত্ব যেন সেগুলোতে থাকে। কিন্তু সমাজের কোন স্তরে কারা কীভাবে পড়ে আছে, কতজন কোন অবস্থায় আছে সেসব যদি নাইবা জানি তবে সে 'জনগণ' এর জীবন বদলের জন্য আইন বা নীতি প্রণয়ন করবে কীভাবে?

ভবঘুরের সংখ্যা জানার চেষ্টা করা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একবার সমাজকল্যান মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন- 'বাংলাদেশর যে যে শহরে পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমতিপ্রাপ্ত পতিতালয় চালু আছে সেসব শহরের প্রত্যেকটিতে অনুমোদিত বারবণিতার সংখ্যা কত?' মূলত, বাংলাদেশের পল্লীর আনাচে কানাচে

২ .পৃষ্ঠা ৩৭, সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২ গণপরিষদের রাষ্ট্রভাবনা, আসিফ নজরুল, প্রথমা প্রকাশন।

৩ .পৃষ্ঠা ২৬১, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম, সম্পাদনায় মঙ্গল কুমার চাকমা, প্রকাশনায়- এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন।

যেসব নারীরা দেহ বিক্রি করে জীবন অতিবাহিত করছে তাঁদের সংখ্যা জানতে চান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। সেদন ছিল ২৭ জুন, ১৯৭৩। সংসদে তিনি প্রশ্ন করছেন– 'সরকার সম্প্রতি কোন কোন শহরে বারবণিতাদের উচ্ছেদ করিয়াছেন? তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইয়াছে?' একই জিজ্ঞাসায় তিনি উত্থাপন করেন, 'সরকার সামগ্রিকভাবে বারবণিতাদের (পতিতাদের) পুনর্বাসনের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহনের ইচ্ছা রাখেন কী না?[৪]'

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র এমনি জিজ্ঞাসায় তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেছেন– 'তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে[৫]।' আমি অনেকটা নিশ্চিত যে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ভাষ্যে 'নরক যন্ত্রণায় থাকা' পতিতাবৃত্তির সাথে যুক্ত নারীদের সংখ্যা এখনো সরকারের তালিকায় নেই এবং তাদের জীবন বদলের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এখনও প্রণয়ন করা হয়নি।

সমাজের নানা স্তরের মানুষের জীবন বদলের প্রস্তাবনা ছাড়াও বাক স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার বিষয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নানা প্রশ্ন সংসদে উত্থাপন করেছেন যেগুলো বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের নেতৃত্বের জন্য অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছি দেশে সরকারি টেলিভিশন ও বেতার ব্যবহৃত হয় ক্ষমতার মসনদে থাকা দলটির প্রচার মাধ্যম হিসেবে। অথচ নাম দেয়া হয় বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার। কিন্তু এই দুই প্রতিষ্ঠান যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের প্রচার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি থেকে প্রচারিত নানা খবরগুলো আমিও অনুসরণ করবার চেষ্টা করি। বাংলা ছাড়াও চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় নানা অনুষ্ঠান ও খবর প্রচারিত হয় সেখানে। তবে খবরগুলো অনেকটা রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের নিয়মিত কর্মসূচীর আপডেট হিসেবেই আমি দেখেছি। এ বিষয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ৪ জুলাই ১৯৭৩ সালে তথ্য ও বেতার মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন- 'রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংবাদ, বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সরকার বিরোধী মতামত উপস্থাপনের সুযোগ-সুবিধা আছে কী না? থাকলে উহা কী?[৬]'

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র এমনি প্রশ্নে দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী শেখ আব্দুল আজিজ খান যদিও 'বাংলাদেশের সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বার্ধীনতা রহিয়াছে' বলে যে গালমন্দ করেছেন তা আজকের বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার দেখলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। কেননা, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পর্দা খুললেই আমরা শাসক দলের নানা কর্মসূচী ও উন্নয়ন ফিরিস্তি প্রচার বৈ আর কিছু দেখি না। তাইতো প্রায় সময় দেশের বিরোধী মতের উপর নানা দমন পীড়ন চলমান থাকলেও এবং সমাজে নানা অসঙ্গতি চোখে পড়লেও বাংলাদেশ টেলিভিশনের পর্দায় এসব খবরের বিপরীতে দেশের নানা প্রান্তের বাতাবি লেবুর বাম্পার ফলনের কথা বারংবার চোখে পড়ে।

নানা জনের লেখায় ও আলোচনায় সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দাবি করা 'আমি বাঙালি নই'[৭] এমন বাস্তবসিদ্ধ আলাপগুলো প্রায় মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু তিনি কেবল পাহাড়ের মানুষের জন্য নয়। বরং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র চিন্তা ও মনস্তত্ত্বের ক্যানভাসে 'জনগণ' বলতে যারা আছে তার ব্যাপ্তি বেশ প্রসারিত। তিনি যে অঞ্চল থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁদের অধিকারের কথা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি মেথরের জন্যও নতুন ভোরের স্বপ্ন এঁকেছেন তাঁর প্রস্তাবনায়। একই সাথে বেদে, কামার, কুমোর, পতিতা এমনকি ভবঘুরে মানুষের জীবন বদলের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর নানা প্রস্তাবনায়। কাজেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার গণ জিজ্ঞাসার জাল সমাজের সকল শ্রেণি, পেশা, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি ও ধর্মকে নিয়েই বিস্তৃত। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র এই 'গণ' ভাবনার বহিপ্রকাশ পাওয়া যায় গণপরিষদে দেওয়া তাঁর প্রথম প্রস্তাবনার মধ্যেও। সেদিন ছিল ১৯ অক্টোবর ১৯৭২। তাঁর বন্ধু গণপরিষদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত প্রস্তাবনা দিয়েছেন সদ্য স্বাধীন দেশের সংবিধান যেহেতু প্রণয়ন হচ্ছে সেই খসড়া সংবিধানটির পক্ষে-বিপক্ষে জনমত যাচাইয়ের জন্য ৩০ অক্টোবর ১৯৭৩ পর্যন্ত প্রচার করা হোক।[৮] সেই প্রস্তাবের একমাত্র সমর্থনকারী হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদে দাড়িয়ে বলেছেন– 'এই মহান গণপরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে যাচ্ছে। তাই যেসব নীতির উপর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে চলেছে সেসব নীতি যদি ঠিকভাবে সংযোজিত না হয়, তাহলে সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে[৯]।'

কিন্তু কার কথা কে রাখে। তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রস্তাবকে 'মূল্যবান সময় নষ্ট করার'[১০] সামিল বলে উল্লেখ করেছেন। ফলে গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠদের কণ্ঠভোটে সেই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

৪. পৃষ্ঠা ২৪৯, প্রাগুক্ত।
৫. পৃষ্ঠা ২৪৯, প্রাগুক্ত।
৬. পৃষ্ঠা ২৫৮, প্রাগুক্ত।
৭. পৃষ্ঠা ১৯২, প্রাগুক্ত।
৮. পৃষ্ঠা ৩৬, সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২ গণপরিষদের রাষ্ট্রভাবনা, আসিফ নজরুল, প্রথমা প্রকাশন।
৯. পৃষ্ঠা ১৭৭, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম, সম্পাদনায় মঙ্গল কুমার চাকমা, প্রকাশনায়- এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন।
১০. পৃষ্ঠা ৩৬, সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২ গণপরিষদের রাষ্ট্রভাবনা, আসিফ নজরুল, প্রথমা প্রকাশন।

একই বক্তৃতায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছেন, 'তাড়াহুড়ো করে সংবিধান পাশ না করে, একদিন দেরি করে, প্রয়োজন হলে দশ দিন দেরি করে আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে চেষ্টা করবো[১১]।' কিন্তু যিনি সর্বাঙ্গ সুন্দর সংবিধানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর দেশ কল্পনা করেছেন সেই দেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি আজ নানা গোঁজামিলে পূর্ণ। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতিনিধিত্ব করা জুম্ম জনগণের ভাগ্য আজ অনিশ্চিত এক পথে ধাবমান, দেশের অপরাপর আদিবাসী মানুষের অধিকার আজ ভুলুণ্ঠিত। নিম্ন আয়ের মানুষসহ নানা ক্ষেত্রে যারা প্রান্তিকতার সীমায় যাপন করছে নিজেদের জীবন তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি বা কর্মপরিকল্পনা নেই সরকারের নীতি নির্ধারকদের। তাঁদের কাছে 'জনগণ' বা 'গণ' অর্থে যাদের বোঝানো হয় তার পরিধি খুবই সীমিত। অথচ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার গণ জিজ্ঞাসায় আছে সর্বজন। কানা, বোবা, খোঁড়া, জুম্ম, আদিবাসী, বাঙালি, অ-বাঙালি, সরকারি দল, বিরোধী দল, পুরুষ, নারী, প্রতিষ্ঠিত মানুষ কিংবা ভবঘুরে, মেথর, জেলে, কামার এমনকি বেদে[১২]। তাই এখনও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার গণ জিজ্ঞাসা সর্বাঙ্গ সুন্দর দেশ নির্মাণের জন্য অতি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

> 'কৃষির উন্নয়নের দিকে যেমন আমাদের নজর দিতে হবে, তেমনি আমাদের শিল্প ও কল-কারখানার দিকেও নজর দিতে হবে। শিল্প ক্ষেত্রে আমরা যেন পিছনে পড়ে না থাকি এবং শিল্পোন্নতিতে আমরা যেন অন্য রাষ্ট্রের বা উন্নতিশীল দেশের সম মর্যাদায় পৌঁছতে পারি, সেদিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের যেসব কল-কারখানা এখনও অকেজো বা অক্ষম হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে কর্মক্ষম করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে উন্নতমানে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যেন সব বিষয়ে স্বনির্ভরশীল হতে পারি।'
>
> *– এম এন লারমা*
>
> *বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার উপর মতামত,*
> *২৩ জুন ১৯৭৩, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক, খণ্ড ২ সংখ্যা ১৭*

১১. পৃষ্ঠা ১৮০, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম, সম্পাদনায় মঙ্গল কুমার চাকমা, প্রকাশনায়- এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন।
১২. পৃষ্ঠা ১৮২, ১৮৩, প্রাগুক্ত।

ফিলিস্তানীদের জন্য যখন কাঁদবেন, পাশের বাড়ির পাহাড়িদের জন্যও একটু কাঁদবেন

ইমতিয়াজ মাহমুদ

১.

গাজায় মৃত্যু আতঙ্কে থাকা ফিলিস্তিনিদের অবস্থা সম্ভবত আমি খানিকটা অনুভব করতে পারি। মাত্রাগত তারতম্য থাকলেও মোটামুটি (প্রায় বা অনেকাংশেই) একইরকম ঘটনা আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমিতেও দেখেছি। সত্তরের দশকের শেষদিকে, জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, তাঁর নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল থেকে নিয়ে গিয়ে অসংখ্য বাঙালী পরিবারকে সেটেলমেন্ট দেওয়া হলো। প্রতিটি পরিবারকে ভূমি বরাদ্দ দেওয়া হলো, নগদ টাকা দেওয়া হলো আর সাথে রেশন দেওয়া হলো। সর্বশেষ যখন আমি খবর নিয়েছি, এই সেটেলাররা এখনো নিয়মিত রেশন পায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী সেটেলার আর প্যালেস্টাইনের ভূমিতে ইহুদী সেটেলার ওদের মধ্যে নানারকম পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে- কিন্তু মূল বৈশিষ্ট্য একই। হঠাৎ করে আপনি দেখলেন আপনার নিজের ভূমিকে আপনি আর চিনতে পারছেন না। এর ডেমোগ্রাফিক প্যাটার্ন পাল্টে গেছে। সরকারি সেটেলাররা সংখ্যায় আপনার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। আপনার এলাকার যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সেটা পাল্টে গেছে। আর সেটেলার যারা, দেখতে পাচ্ছেন যে ওরা আপনার প্রতি বৈরি, পদে পদে আপনার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। আপনার পিতৃ-পিতামহেরও আগে থেকে যে ভূমিকে আপনি আপনার নিজের জেনেছেন, সেগুলি ওরা দখল করে নিচ্ছে।

২.

আর দুই ক্ষেত্রেই, সেই সেটেলারদের পৃষ্ঠপোষক ও পাহারাদার হিসাবে নিয়োজিত আছে সশস্ত্র বাহিনী। এইসব বাহিনী আপনার পাড়ায় গ্রামে ওদের বুটের আওয়াজ তুলে টহল দিচ্ছে। স্থানীয় আদিবাসীদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, যখন তখন তল্লাশি করছে। সেটেলাররা ছুতানাতায় স্থানীয় ক্যাম্পে গিয়ে নালিশ করে। সরকারি বাহিনীর হাতে মাঝে মাঝেই নিহত হয় বা নির্যাতিত হয় আপনাদের লোকজন। প্যালেস্টাইন আর বাংলাদেশের পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মিলও আছে। সেটেলারদের উপস্থিতির ফলে কোন কোন এলাকার এথনিক ক্লিঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে- আমাদের দেশেও, প্যালেস্টাইনেও।

আজ যখন ইসরাইলের বাহিনী গাজায় সর্বাত্মক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমরা সকলেই ইসরাইলি বাহিনীর এইরকম নৃশংস কর্মকান্ডের নিন্দা করছেন আপনারা সকলেই। কেউ কেউ হামাসকেও নিন্দা করছেন, সাথে ইসরাইলকেও। সকলেই চাইছেন যেন সেখানে রক্তপাত না হয়। যেন সেখানে শিশু হত্যা না হয়। সকলেই চাইছেন যেন যার যার ভূমিতে সকল মানুষ নিরাপদে বাস করতে পারে। সকলেই চাইছেন ইসরাইলী সেটেলাররা যেন আর কোন ফিলিস্তিনি ভূমি দখল না করে, আর যেন সেটেলারদের জন্যে বসতি স্থাপন করা না হয়। আপনারা ভাল মানুষ, হৃদয়বান মানুষ, ন্যায়বোধ আছে আপনাদের, সেজন্যে এইসব দাবী করছেন।

৩.

আপনারা ভালো মানুষেরা, দেশের দিকেও মাঝে মাঝে একটু দেখবেন। এই তো দুই তিনদিন আগে একটা ওয়েব পোর্টালে খবর দেখলাম লংগদুতে কিছু আদিবাসী মানুষ মিছিল করছে। কি হয়েছে? সেটেলাররা সেখানে নাকি একটি বৌদ্ধ মন্দিরের জায়গা দখল করে নিয়েছে। এই লংগদুতেই কয়েক বছর আগে একদিনে আদিবাসীদের তিন শতাধিক ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার ছিল। সেটেলাররা মিটিং করেছে, মিছিল করেছে, তারপর গিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে- সবকিছু জুমার আগে আগে শেষ। সেই কাণ্ডের এখনো কোন বিচার হয়েছে? পাহাড়িদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কারোর শাস্তি হয়েছে?

আমার হৃদয় ফিলিস্তিনিদের কাছে চলে যায়- কোন ধর্মীয় কারণে নয়, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে মুসলমান আছে, খৃস্টান আছে, অল্প কিছু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও আছে। মায়া আমার ইহুদীদের জন্যেও আছে- শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওদের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে সে তো আমি অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু তাঁর জন্যে ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করে দিতে হবে? ফিলিস্তিনিদের সাথে আমার এই আত্মার সংযোগ এইখানে। ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আমি চাকমা, মারমা, লুসাই, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীসমূহের চেহারা দেখতে পাই। নিজ ভূমিতে এইরকম প্রতিনিয়ত ধারাবাহিক অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হওয়া- সেই ব্যাথা আমি জানি।

৪.

আপনারা ভালমানুষেরা, আপনারা যখন আজ আমার মতই ফিলিস্তিনিদের জন্যে কাঁদবেন, চোখের জল ফেলবেন- মেহেরবানী করে এক ফোঁটা অশ্রু আপনার পাশের বাড়ীর আপনজন আদিবাসীদের জন্যেও ফেলবেন। ফিলিস্তিনিদের পক্ষ হয়ে যখন প্রতিবাদ করবেন, তখন আমাদের পাহাড়ের জন্যেও একটা দুইটা বাক্য বলবেন। সেটা যদি আপনি না করেন, ফিলিস্তিনিদের জন্যে আপনার প্রতিবাদ ন্যায়সঙ্গত হবে না।

লেখাটি আইনজীবী ইমতিয়াজ মাহমুদের ফেসবুক টাইমলাইন থেকে নেয়া।

১০ই নভেম্বরঃ মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণা যোগাবে

বাচ্চু চাকমা

ষড়ঋতুর চক্রাকারে প্রকৃতির নিয়মে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও শোকাবহ ১০ই নভেম্বর জুম্ম জাতীয় জীবনে মুক্তিকামী জুম্মদের কাছে সংগ্রামী বার্তা ও গভীর প্রেরণা নিয়ে হাজির হয়েছে। জুম্ম জাতির জাতীয় জীবনে এদিনটি শোক, বেদনা ও বিষাদে ভরা। জুম্ম জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণ্যতম ১০ই নভেম্বর জন্ম দিয়ে সমগ্র দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষকে করেছে হতবাক। এদিনটি জুম্ম জাতীয় শোক দিবস! জুম্ম জাতির একমাত্র মুক্তির দিশারী, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই সংগ্রামের পুরোধা ও জুম্ম জনগণের প্রাণের মানুষ বিপ্লবী এম এন লারমাকে এদিনে হারিয়েছি।

১০ই নভেম্বর দিবসে বিপ্লবী এম এন লারমাকে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে স্মরণ করে দায়িত্ব শেষ করলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তাঁর জীবন ও সংগ্রামকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচিন নয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে জুম্ম জাতির সামগ্রিক মুক্তির ব্যাপারে তিনি যে দায়িত্ব পালন করে গেছেন, আগামী শত বছরেও আমরা সবাই মিলে তা পালন করতে পারবো কিনা সন্দেহ থেকে যায়। তিনি ভোগবাদী সমাজের দালালীপনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা, সুবিধাবাদীতা, সংকীর্ণতা, ব্যক্তি-স্বার্থপরতা, আন্দোলনের প্রতি দোদুল্যমানতা ও সকল প্রকার পিছুটানকে জয় করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মুক্তির স্বপ্ন বুনেছেন। সেই স্বপ্নের উপর ভর করে বাস্তবে তাঁর দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে জুম্ম জাতির জাতীয় জীবনে নব ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। মহান নেতা নিপীড়িত, নির্যাতিত জুম্ম জনগণের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর প্রদর্শিত আদর্শ ও আত্মোৎসর্গকে জুম্ম জাতির ইতিহাসে বিশেষ করে তরুণ সমাজের মননে ও চিন্তায় লালিত করতে আরও অধিকতর আগ্রহী হতে হবে। পূর্বের যে কোনো শাসকের ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে শাসন-শোষণের জোয়ালকে বিপ্লবী এম এন লারমা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী যখন ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক সত্তাকে পদদলিত করে জুম্ম জনগণকে বিলুপ্তিকরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তখন বিপ্লবী এম এন লারমার নেতৃত্বে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংগ্রাম শুরু হয়। সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী এম এন লারমার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা জুম্ম জনগণের সকল স্তরে-সকল পর্যায়ে, পাহাড় থেকে সমতলের অসংখ্য দেশপ্রেমিক মানুষের হৃদয়ে আন্দোলিত করেছে। একটা শক্তিশালী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করার তাঁর অদম্য সাহস, শক্তি, কৌশল, সংগ্রামের অটুট মনোবল, জুম্ম জনগণের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আন্দোলনের প্রতি দৃঢ়তার ফলে তাঁকে নিয়ে গেছে সংগ্রামের শীর্ষে। জুম্ম জাতির সবচেয়ে প্রাণের মানুষ, শ্রদ্ধাভাজন, স্মরণীয় ও বরণীয় একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক জুম্ম তরুণ সমাজ বিপ্লবী এম এন লারমার প্রদর্শিত আদর্শের অনুসারী হয়ে উঠে। জুম্ম সমাজের পশ্চাদপদ সামন্তীয় চিন্তাধারা থেকে বেড়িয়ে এসে নতুন কিছু সৃষ্টির অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ নিয়ে জুম পাহাড়ের বুকে বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে ঘুরে দাঁড়ানোর অসংখ্য বাঁকগুলি জানা ও বুঝতে পারা এবং এব্যাপারে গভীর উপলব্ধির সীমা ছাড়িয়ে বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটানো আজও সময়ের দাবী। 'ক্ষমা করা আর ভুলে যাওয়া' নীতির উপর ভিত্তি করে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদের কাছে টেনে নিয়ে পরিবর্তনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বস্তু যেহেতু পরিবর্তনশীল সেহেতু বিভেদপন্থীরা নিজেই আত্মজিজ্ঞেসার মাধ্যমে সৎপথে ফিরে আসবে- এই প্রত্যাশা অবশ্যই ছিল। কিন্তু অবিশ্বাসের ভূত বিভেদপন্থীদের মন থেকে সরে যায়নি। বিপ্লবী এম এন লারমা জীবিতকালে তাঁর পরম মমতা, সহনশীলতা ও ক্ষমাশীল মনোভাবকে বিভেদপন্থীরা দুর্বলতা হিসেবে সুযোগ নিয়েছেন। সেই সুযোগে ১০ নভেম্বরে বিপ্লবী এম এন লারমাকে হত্যা করে ক্ষমতা কেড়ে নেবার উন্মত্ততায় ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেন।

ক্ষমাগুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তন হওয়ার গুণ- এই তিনটি গুণের অধিকারী না হলে সত্যিকার অর্থে বিপ্লবী হওয়া যায় না। এই তিনটি ঐতিহাসিক গুণ কোনটাই জুম্ম জাতির জাতীয় বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক ও বিভেদপন্থীদের মন গলাতে পারেনি। প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদের মনে বিপ্লবী এম এন লারমার প্রদর্শিত আদর্শ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য সরকারের ঔপনিবেশিক ও ষড়যন্ত্র দিবালোকের মতো পরিষ্কার। এই হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারের ষড়যন্ত্রের কোন শেষ নেই। এরই পাশাপাশি ভূমি বেদখল, উচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িক হামলা, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকগত আগ্রাসন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন, ধর্মীয় আগ্রাসন-সর্বোপরি জনমিতি বদলে দিয়ে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার চক্রান্ত বাধাহীনভাবে

চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। সমগ্র জুম্ম জনগণ প্রতিনিয়ত শোষিত ও বঞ্চিত হতে হতে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে চলে যাচ্ছে।

মূলতঃ এই শোষণের বিরুদ্ধে তৎকালীন জুম্ম জনগণের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও বিপ্লবী এম এন লারমা বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রথম স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুলে ধরেন। এই স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এবং বিকাশের দিকে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত হবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে সেদিন উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাম্ভিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যাখান করে তা ধীরে ধীরে জুম্ম জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়। জুম্ম জনগণের জাতীয় বিপর্যয়ের বিষয়ে বিপ্লবী এম এন লারমা গভীরভাবে অনুভব করেন। তারই প্রেক্ষিতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন।

১০ই নভেম্বর নিয়ে জুম্ম সমাজের সকল পর্যায়ে পর্যালোচনা করতে হবে। এই পর্যন্ত জুম্ম জাতি কি পেয়েছে আর কি পায়নি অথবা সফলতা-ব্যর্থতার দিকগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে সবদিক ও সব সংযোগ হিসাব-নিকাশ করতে জানতে হবে। দীর্ঘ দুই যুগের অধিক হাজারো ত্যাগ ও রক্তাক্ত সংগ্রামের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। বরঞ্চ রাজনৈতিক ছলনার মাধ্যমে জুম্ম জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে সরকার। নিজেদের ভাগ্য নিজে গড়ার জন্য এবং নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জুম্ম জনগণ চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য অধিকতর আন্দোলনের ব্যাপারে তরুণ সমাজকে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের জুম্ম তরুণ সমাজ এখনও নিজেকে জানবার জন্য উদাসীন ও নির্লিপ্ত। বিপ্লবী এম এন লারমার সংকল্প থেকে কেন আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি বা কেন আমরা রাজনৈতিকগতভাবে উন্নতি সাধনে দ্বিধাগ্রস্থ এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজে বের করা জুম্ম তরুণ সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করি। রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর এর ইতিহাস সম্যকভাবে জুম্ম তরুণ সমাজকে জানতে হবে ও অধিকতর আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

'যে জাতি সংগ্রাম করতে জানে না, সে জাতির পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না'– বিপ্লবী এম এন লারমার এই উক্তি বিজ্ঞান সম্মত বলে প্রমাণিত হয়েছে। জুম্ম জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আজ পর্যন্ত বিপ্লবী এম এন লারমসহ অসংখ্য সংগ্রামী বন্ধু আত্মবলিদান করে গেছেন। বিপ্লবী এম এন লারমার জীবন ও সংগ্রাম জুম্ম তরুণ সমাজকে গভীর প্রেরণা যোগাবে- এটাই কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

> আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

১০ই নভেম্বর ও আজকের পার্বত্য পরিস্থিতি

শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা

মহান বিপ্লবী, জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও সাবেক সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশের এক বিশ্বাসঘাতকতা -মূলক অতর্কিত হামলায় তিনি নৃশংসভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। চার কুচক্রী নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির আশায় কায়েমী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মহান চিন্তাবিদ, আপোষহীন সংগ্রামী, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করলেও তাঁর শাশ্বত দর্শন ও বিপ্লবী চেতনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে শহীদ এম এন লারমা জীবন্ত এম এন লারমার চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী, আরো বেশি দুর্বার।

এম এন লারমাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম দেশের জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসনের কথা তুলে ধরেন। তিনি জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক আন্দোলন ও একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দল গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি বলেছিলেন, 'দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি। ...আমি বলেছিলাম অধিকার হারা মানুষের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, যারা কল-কারখানায় চাকুরি করে, সেই শ্রমিক ভাইদের কথা, যারা দিনরাত রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শক্ত মাটি চাষে সোনার ফসল ফলায়, সেই চাষী ভাইদের কথা। যারা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে, আমি তাদের কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম সেই ভিখারীদের কথা, যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে 'আমাকে একটা পয়সা দাও' বলে।'

এম এন লারমা শুধু রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সচেতন পরিবেশবাদী। তিনি শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত নয়, বরং তা তিনি যৌথ জীবনে এবং জাতীয় জীবনে প্রকৃতিসহ জীব পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ রক্ষার নীতি মেনে চলার প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। বনের পশু রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বড়ই কড়া। নারী অধিকার নিয়ে এম এন লারমা ছিলেন বরাবরই সোচ্চার। জুম্ম নারী সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার অপরিহার্যতা তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন।

এম এন লারমার গড়ে তোলা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ফসল হিসেবে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের শাসকগোষ্ঠী সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। শাসকগোষ্ঠী যে দলেরই হোক না কেন তারা পাহাড়ী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারা একাধারে সমতল অঞ্চল থেকে বাঙালী অনুপ্রবেশ এবং জুম্মদের তাদের চিরায়ত ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা-জমি জবরদখল করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ ২৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মূল বিষয়সমূহের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদিসহ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তর করা; নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়নপূর্বক তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তদানুসারে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা; 'অপারেশন উত্তরণ' নামক একপ্রকার সেনাশাসনসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা; ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে বেহাত হওয়া জায়গা-জমি জুম্মদের নিকট ফেরত দেয়া; ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন প্রদান করা; অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিল করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা; চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য

অন্যান্য আইন সংশোধন; পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের সম্মানজনক পুনর্বাসন করা ইত্যাদি অন্যতম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার প্রায় ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রয়েছে। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসেনি। একদিকে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির দোহাই দিয়ে পূর্বেকার মতো জেলার সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন, অন্যদিকে আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের এখতিয়ারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এবং দলীয়করণের মাধ্যমে সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে অগণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ইহার সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বর্তমানে আওয়ামীলীগ সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। ফলে জনসংহতি জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার ব্যক্তি ও সংগঠনকে ক্রিমিনালাইজ (অপরাধীকরণ) করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত' ইত্যাদি আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক সাজানো মামলা দায়ের করা, তাদের ঘরবাড়ি তল্লাশি ও জিনিসপত্র তছনছ করা, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার করা, ক্রসফায়ারের নামে গুলি করে হত্যা করা, ক্যাম্পে নিয়ে মারধর করা ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় স্থায়ী দমন-পীড়নের মাধ্যমে, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও দাবি সংস্কৃতি বিধ্বংসী তথাকথিত উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ভূমি বেদখল ও জুম্মদেরকে চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে, জুম্মদের উপর উগ্র বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে, বহিরাগত মুসলিমদের পার্বত্য অঞ্চলে বসতিপ্রদান ও অনুপ্রবেশ করে সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঁচ দশক ধরে দেশের একের পর এক শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে।

মহান বিপ্লবী এম এন লারমা জুম্ম জনগণের জাতীয় মুক্তি ও শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তাঁরই নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ আন্দোলন শুরু করেন। সেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে জুম্ম জনগণ আজ অবধি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে ক্ষেত্রে জুম্ম তরুণ সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু আজকের শিক্ষিত তরুণ সমাজ অত্যন্ত আত্মমুখী ও আন্দোলনে সামিল হতে দ্বিধাগ্রস্ত অথচ পার্বত্য অঞ্চলের বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জুম্ম তরুণ সমাজকে মহান নেতার প্রদর্শিত নীতি আদর্শ ধারণ করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে অধিকতরভাবে অংশগ্রহণ একান্তই জরুরি।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।'

–মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক

উষাতন তালুকদার

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের নীতি লঙ্ঘন করে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির ফলে। উল্লেখ্য, স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, খিয়াং, লুসাই, খুমী, পাংখো ও চাক প্রভৃতি ভিন্ন ভাষাভাষি ১১টি জাতির বসবাস রয়েছে, যারা নিজেদেরকে 'জুম্ম' (পাহাড়ের অধিবাসী) হিসেবে পরিচিতি প্রদান করে থাকে। এছাড়া রয়েছে কিছু গোর্খা, অহমিয়া ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠী।

'৪৭ সালে দেশভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯৮.৫ শতাংশ লোক ছিল অমুসলিম, যারা বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। স্বভাবতই অমুসলিম জুম্ম জনগণ আশা করেছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে। এলক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ষড়যন্ত্র ও তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদাসীনতার কারণে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর শুরু হয় নিপীড়ন-নির্যাতন ও অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র, তথা জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের কার্যক্রম।

তারই অংশ হিসেবে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভে ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রিত হাজার হাজার মুসলমান জনগোষ্ঠীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বসতিপ্রদান করা হয়। পাকিস্তান আমলে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের সবচেয়ে মারাত্মক কার্যক্রম ছিল ষাট দশকে স্থাপিত জুম্ম জনগণের মরণ ফাঁদ কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ। এই বাঁধের ফলে নিজ বাস্তুভিটা থেকে এক লক্ষাধিক জুম্ম উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় চাষযোগ্য জায়গা-জমি না থাকায় এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসন না করায় ৪০ হাজার চাকমা জনগোষ্ঠী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, যারা এখনো অরুনাচল প্রদেশে নাগরিকত্বহীন জনগোষ্ঠী হিসেবে দুর্বিসহ জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা তথা জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের কার্যক্রম আরো জোরদার হয়ে উঠে। '৭২-এর সংবিধান প্রণয়নকালে তৎকালীন গণপরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য চারদফা সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। কিন্তু সেই সংবিধানে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। উল্টো সংবিধানে ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দেশ স্বাধীন হতে না হতেই ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে লঙ্ঘন করে হাজার হাজার মুসলমানদেরকে খাগড়াছড়ির ফেনী অঞ্চলে বসতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়ার আমলে সংবিধানের চারটি মূলস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ 'ধর্ম নিরপক্ষেতা' মুছে দিয়ে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' অন্তর্ভুক্তি এবং ১৯৮৮ সালে জেনারেল এরশাদের আমলে সংবিধানে 'ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামীকরণের ধারা জোরদার হয়ে উঠে।

১৯৭৯ সালে আশি দশকে সরকারি উদ্যোগে জুম্ম জনগণের জায়গা-জমির উপর বসতিপ্রদান করা হয় চার লক্ষাধিক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে। জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের উদ্দেশ্যে শুরু হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতায় মুসলিম সেটেলার কর্তৃক বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্ম অনুসারী জুম্ম জনগণের উপর একের পর এক গণহত্যা, ভূমি বেদখল, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, ধর্মীয় পরিহানি, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যক্রম। আশি ও নব্বই দশকে সংঘটিত হয় কমপক্ষে ১৫টি গণহত্যা।

শেখ হাসিনা সরকার জুম্ম জনগণের আন্দোলনের মুখে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের সাম্প্রদায়িক নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ফলে চুক্তির কিছু বিষয় সরকার বাস্তবায়ন করলেও চুক্তির উপরোক্ত মৌলিক বিষয়সমূহসহ চুক্তির অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে আসেনি। চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্যতম পক্ষ জনসংহতি সমিতির মতে, চুক্তির

৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ধারা এখনো অবাস্তবায়িত রয়েছে, যা বিভিন্ন স্বাধীন ও নিরপক্ষে গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ফলাফলেও ফুটে উঠেছে। অথচ সরকার দেশে-বিদেশে অসত্য তথ্য প্রচার করছে যে, চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের পরিবর্তে সরকার অতি সুক্ষ্ম কৌশলে রোহিঙ্গাসহ সমতল জেলাগুলো থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠী বসতি প্রদান করে চলেছে। মুসলিম সেটেলারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের পরিবর্তে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলে মদদ দেয়া হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে এখনো সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো হস্তান্তর করা হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত ২৬ বছরেও এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের স্বশাসন ব্যবস্থা এখনো যথাযথভাবে গড়ে উঠেনি।

জুম্ম শরণার্থীদের সাথে সরকারের ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ত্রিপুরা থেকে জুম্ম শরণার্থীদের ১২,২২২ পরিবার প্রত্যাবাসন করা হলেও এখনো তাদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন করা হয়নি। এখনো ৯,০০০ পরিবার তাদের ভূমি ফেরত পায়নি। ৪০ গ্রাম এখনো মুসলিম সেটেলারদের দখলে রয়েছে। আভ্যন্তরীণ জুম্মদেরকেও পুনর্বাসন করা হয়নি। প্রায় এক লক্ষ পরিবার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু এখনো রিজার্ভ ফরেষ্টে বা আত্মীয়-স্বজনের জায়গা-জমিতে উদ্বাস্তু জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। মুসলিম সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত একটি ভূমি বিরোধও নিষ্পত্তি করে জুম্মদের নিকট ফেরত দেয়া হয়নি। ভূমি কমিশন গঠিত হলেও কমিশনের বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় বিগত ২৬ বছরেও ভূমি কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ শুরু করতে পারেনি।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার এখন পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের নীতি অনুসরণ করে পার্বত্যাঞ্চলে ব্যাপক সামরিকায়ন করে দমন-পীড়নের মাধ্যমে ফ্যাসীবাদী কায়দায় সমাধানের নীতি বেছে নিয়েছে। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইনসার্জেন্সির অবসান হলেও শেখ হাসিনা সরকার ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে পার্বত্যাঞ্চলে সামরিক শাসন জারি করে। 'অপারেশন উত্তরণ'-এর ক্ষমতাবলে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। অধিকন্তু, ৫৪৫টি অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে মাত্র ১০১টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার আবার নতুন করে একের পর এক নতুন ক্যাম্প স্থাপন করে চলেছে।

২০১৪ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। সরকার কেবল চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখেনি, তার সাথে চুক্তিকে নানাভাবে পদদলিত করে চলেছে। এর ফলে চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অধিকতর জটিল ও সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের চলমান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে সরকার 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'চাঁদাবাজি' কার্যক্রম হিসেবে আখ্যায়িত করে ক্রিমিনালাইজ করে চলেছে। ফলে জুম্ম জনগণের জীবনে নির্বিচারে গ্রেফতার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণ, জামিনে মুক্তির পর জেল গেইট পুনঃগ্রেফতার, ক্রসফায়ারের নামে বিচার-বহির্ভুত হত্যা, ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন, রাত-বিরাতে ঘরবাড়ি তল্লাশি ও হয়রানি, নারীর উপর সহিংসতা ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী সরকারগুলো কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে উস্কে দেয়া সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও উত্তেজনা নিরসনের পরিবর্তে বর্তমানে সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক প্ররোচনা আরো জোরদার করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী ও ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক মুসলিম সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ নামক একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনে সংগঠিত করে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম, ভূমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা ইত্যাদি তৎপরতায় লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। চুক্তি-উত্তর সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম সেটেলার কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর ২০টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। এসব হামলায় শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অনেক নারী ও শিশু ধর্ষণ যৌন সহিংসতার শিকার হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী আদিবাসী জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহ নির্মাণ, গরু-ছাগল পালন, সুদ-মুক্ত ঋণ ইত্যাদি প্রলোভন দেখিয়ে বান্দরবান জেলায় ধর্মান্তরকরণ চলছে। বান্দরবান জেলায় 'উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘ', 'উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা' ও 'উপজাতীয় আদর্শ সংঘ বাংলাদেশ' ইত্যাদি সংগঠনের নাম

দিয়ে জনবসতিও গড়ে তোলা হয়েছে এবং এসব সংগঠনের মাধ্যমে জুম্মদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালানো হচ্ছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্মীয় পরিহানি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও মন্দির স্থাপনে বাধা প্রদান করে চলেছে। এছাড়া প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় পার্বত্যাঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বিয়া, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), আরাকান রোহিঙ্গা সালভাশন আর্মী (আরসা) সহ বিভিন্ন ইসলামী জঙ্গীগোষ্ঠী। ভারত ও মিয়ানমার সীমান্ত এবং চট্টগ্রাম বন্দর ঘেষা এই পার্বত্যাঞ্চলটি যদি ইসলামী জঙ্গীগোষ্ঠীর অভয়ারণ্যে পরিণত হয়, তাহলে কেবল বাংলাদেশের জন্য নয়, এটা দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর জন্য হবে চরম জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি।

সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম থেকে এটা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, শেখ হাসিনা সরকার আর চুক্তি বাস্তবায়ন করবে না। পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো শেখ হাসিনা সরকারও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং নানা নিপীড়ন-নির্যাতন ও ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ ও দেশান্তরে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে। এসবের ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূল করা। এভাবেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে জুম্ম জনগণের উপর নীবর গণসংহার বা সাইলেন্স জেনোসাইট (Silence Genocide)।

পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ তথা অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে সুরক্ষা দিতে হলে জুম্ম জনগণকে পার্বত্য চট্টগ্রামে টিকে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করা হয়। এলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উৎসাহিত করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটিকে ভারতীয় গণমাধ্যমে তুলে ধরার মাধ্যমে জনমত গঠন করা ও সারাবিশ্বে প্রচার ও জনমত গঠনের জোরদার করা; এবং জুম্ম জনগণের চলমান আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

[গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ বন্ধ কর' শ্লোগানকে সামনে রেখে ক্যাম্পেইন অ্যাগেনস্ট অ্যাট্রোসিটিস অন মাইনরিটি ইন বাংলাদেশ (ক্যাম্ব) ও অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের যৌথ উদ্যোগে 'মানবাধিকার লংঘন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন' বিষয়ে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে প্যানেল আলোচক হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার যে বক্তব্য রাখেন তা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করা হলো।]

> দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

ক বি তা

এম এন লারমা

হ্লানুসাং মারমা

তুমি ছিলে আলোর পথের পথিক,
ছিলে জুম্ম জাতির কান্ডারি।
ছিলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার,
চেয়েছিলে জুম্মদের জন্য ন্যায়বিচার।
তোমাকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

করেছো আমাদের জন্য কতো শত ত্যাগ,
ভেবে আপ্লুত হয়ে ওঠে আমার আবেগ।
তাই তো নিজের জীবনকে বাজি রেখে,
বরণ করেছো মৃত্যুকে হাসিমুখে।
তুমিই ছিলে জুম্মদের পরম আস্থা।

তোমার জন্ম না হলে জুম্মজাতি
পথভ্রষ্ট হয়ে রূপ নিতো নির্বোধ জাতি।
তোমার মৃত্যু যদি না হতো অকালে,
আমাদের দুঃখ-দুর্দশা লেখা থাকতো বিপ্লবের দেয়ালে।

আজ আমরা নিরাপদে নেই,
আমাদের চোখে ঘুম নেই।
চারিদিকে ধর্ষণ, জুলুম ও মিথ্যা অপপ্রচার,
শকুনেরা থাকতে দেয় না শান্তিতে বাঁচার।

পুনরায় ফিরে এসো পার্বত্য এলাকায়,
অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করবো বারান্দায়।
তুমি জুম্মজাতিকে দিয়েছিলে যে আশ্বাস,
পূরণ হবে একদিন, এই আমার বিশ্বাস।

তুমি রবে জুম্মজাতির চেতনায়,
পারবে না কেউ দমাতে এই প্রতিজ্ঞায়।
লড়বো আমরা, তোমার কথা রেখে স্মরণে,
আমাদের অস্তিত্ব করবো রক্ষা এই ভুবনে।

তোমার চেতনায় তরুণ সমাজ অনুপ্রাণিত হয়,
তাই হৃদয় থেকে উপলব্ধি হয়।
তুমি মরে গিয়েও মরনি,
তোমার নাম মনে রাখবে এই ধরণী।

তুমি আসবে বলে

সত্যবীর দেওয়ান

নানা বর্ণের ফুল সংগ্রহে ব্যস্ত আজি সবে,
শিশু, যুবা, আবাল বৃদ্ধবনিতা, সূর্য উঠার আগে।
১০ নভেম্বর তুমি আসবে বলে,
ঐদিনের শহীদদের ফুলেল শ্রদ্ধা জানাব বলে।
শুধু শ্রদ্ধা জানানোই শেষ নয়,
সাথে নিয়েছে তারা দৃপ্ত শপথ,
করিবে সমাপ্ত প্রয়াত নেতার যত অসমাপ্ত কাজ,
মহান আদর্শ তোমার 'মানবতাবাদ'
সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ আজকের ছাত্র যুব সমাজ।
নির্ভীক চিত্তে তাই দায়িত্ব করেছে গ্রহণ,
নিয়েছে শপথ, এগিয়ে নেবে জাতীয়মুক্তি আন্দোলন,
প্রস্তুত তারা আজি লড়াই করিতে মরণপন।
আর এই পথে গজিয়েছে আগাছা যত,
বিনাশ করিতে প্রস্তুত এযুগের তরুন সমাজ।
'নেতা' যায়নিকো বৃথা তোমার আত্মদান,
বরং আত্মত্যাগই তোমায় করেছে মহান।
আদর্শ তোমার সঠিক, গণমুখী প্রদর্শিত পথ,
তাইতো জুম্ম জনগণের ঐক্য এখনও অটুত।
তোমারই আদর্শে বলিয়ান হতে আজ,
ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়েছে আজকের তরুণ সমাজ।
শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে সৃষ্ঠ বিভেদপন্থী যত,
তারা নিজেদের বিবেকের দর্শনে আজ ক্ষতবিক্ষত।
অথচ তাদেরই উদাহরণ দিয়ে তথকথিত নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ,
খুশিতে পঞ্চমুখ হয়ে টকশোতে বলে-
নয়কো জেএসএস একক দল পার্বত্য চট্টলার।
'বহুদলে বিভক্ত তারা, দাবি তাদের এক নয়,'
ভিত্তিহীন সে দাবি নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের,
প্রয়াত নেতার আদর্শ আজও অম্লান,
নতুন প্রজন্ম আজ সে আদর্শের ভিত্তি করেছে নির্মাণ।
শপথ নিয়েছে এগিয়ে নিতে উচ্চতর আন্দোলন,
দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে লড়াই করিতে জীবপ পণ।
মদীয় জীবনের পঞ্চাশটি বসন্ত করেছিনু ব্যয়,
পার্বত্য চট্টলার জুম্ম জাতির মুক্তির প্রত্যাশায়।
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আজ জীবন সায়াহ্নে এসে,
শহীদ বীর সন্তানদের স্মৃতিপটে ভাসে।

১০ই নভেম্বর শিক্ষায় উজ্জীবিত আমি আজ,
আজকের তরুন প্রজন্মর সাথে করেছি শপথ,
জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের এসে
নিবেদিত হবে মদীয় অন্তিম জীবন।
প্রিয় নেতা ফুলেল শ্রদ্ধা জানাতে নব প্রজন্ম আজ,
প্রস্তুত গ্রাম গ্রামান্তরে ২০২৩ এর ১০ই নভেম্বরে,
তুমি আসবে বলে এই পার্বত্য চট্টলায়।

তার নাম শৈল চট্টল

উ উইন মং জলি

দানবের বুটের তলায় পিষ্ট হতে হতে অঙ্কিত হয়েছে যে রক্তাক্ত মানচিত্র,
তার নাম শৈল চট্টল।

জাত্যভিমানের বুলেটে ঝাঁঝরা হতে হতে বয়ে যাওয়া কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, চেঙ্গী, মেয়োনী নদী যত,
তার নাম শৈল চট্টল।

পর্যটনের কড়া প্রসাধনীতে উগ্র হতে হতে হিজড়া বনে যাওয়া চিম্বুক, আলুটিলা, সাজেক, কিয়ক্ক্রুঃডং যত জুম্ম নৈস্বর্গ,
তার নাম শৈল চট্টল।

অবগুণ্ঠিত মানবতার ক্ষত থেকে রক্তাশ্রু ঝরতে ঝরতে মাটিজ জুমিয়াদের দেশান্তরে বাধ্য করেছে যে আবহ,
তার নাম শৈল চট্টল।

হায়েনার ছোবলে সবুজ অরণ্য ধুসর হতে হতে হলুদ জুম ফুলে জেগেছে যে খয়েরী দাগ,
তার নাম শৈল চট্টল।

ভরা আকাশে দূর্যোগের ঘনঘটা দেখতে দেখতে ভীত হওয়ার বিপরীতে বুকে পাষাণ বেঁধেছে যে জনপদ,
তার নাম শৈল চট্টল।

পাঙ্খোয়া যুদ্ধ নাচের দামামা, ম্রো বাঁশির আদিম মূর্ছনা, জুমে নবান্ন উৎসবের কাপ্পিয়া-গেঙ্খুলীর ক্রান্তিলগ্নের বিলাপ খচিত যার নাম,
তার নাম শৈল চট্টল।

তরুণ প্রজন্ম

জড়িতা চাকমা

হে তরুণ, ভয়কে করো জয়, নির্ভয়ে যাও এগিয়ে,
ভীত নয়, হও মানবহিতৈষী, আশার আলো ছড়িয়ে।

অনাগত দিনে তোমরাই হবে জুম্ম জাতির ভরসা,
ন্যায়ের অস্ত্র কাঁধে তুলে নাও, ভাষাহীনের মুখে দিতে ভাষা।

বীরাঙ্গনার মুখে ঝড়বে না কভূ নীরব অশ্রুজল,
হতে হবে ঘর ছাড়া ক্ষণিকের তরে, হে তরুণ দল।

তোরা নতুনের অভিযাত্রী, শাসকের রক্তচক্ষু করে উপেক্ষা,
গর্জে ওঠো তোরা সবাই শাসক গোষ্ঠীকে দিতে উচিত শিক্ষা।

ধৈর্য-শৌর্য দিয়ে ডিঙিয়ে বন্ধুর পথ,
রক্তপিচ্ছিল পথ পেরিয়ে থামবে তবে মুক্তির জয়রথ।

মুক্তি

অমর সুজন চাকমা

আমি আবার লড়ব
তোমারই সন্ধানে,
সন্মুখে পা ফেলব
মুক্তির জয়গানে।

শেষ নিঃশ্বাস অবধি লড়ব
করব সংগ্রাম,
আবারও গাইব আমি
মুক্তির জয়গান।

রক্ত দিয়ে হোলি খেলা
খেলব আবার,
যতদিন না শেষ হয়
নিপীড়ন আর অত্যাচার।

আমি আবার দাঁড়াব
নিয়ে অদম্য শক্তি,
করবো না মাথা নত
যতদিন না মেলে মুক্তি।
রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে
লিখব আমার নাম,
আমি ছিলাম, আমি থাকবো
আদিবাসী জুম্ম যার নাম।

মৃত্যু অবধি লড়ে যাবো
যতদিন আছে শক্তি,
অদম্য সাহসে এগিয়ে যাবো
একদিন মিলবে মুক্তি।

> ‘এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা, প্রাণের কথা এখানে (সংবিধানে) প্রতিফলিত হয়নি বলে আমি মনে করি। কৃষকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, শ্রমিকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, রিক্সাওয়ালার কথা প্রতিফলিত হয়নি, মেথরের কথা প্রতিফলিত হয়নি। আজ এদের সবার জীবন, মেথরের জীবন, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন অভিশপ্ত। তাদের কথা, তাদের দাবি এখানে স্থান পায়নি। এই যে অভিশপ্ত জীবন, তাদের কথা আজকে সংবিধানে নাই।’ *– এম এন লারমা*

ছুটে চলা পাহাড়ের আর্তনাদ শুনতে

ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা

ছুটেছিলাম কোনো এক ভোরে,
শুকতারা যখনি জ্বলজ্বল করে হাসে,
জোনাকি যখনি মিট মিট করে জ্বলে,
কুয়াশায় ঢাকা উঁচু-নিচু পাহাড়,
শিশির ভেজা সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে,
চিম্বুক পাহাড়ের বুকে।

পায়ে হেঁটে বেয়ে চলা
উঁচু-নিচু নির্জন পাহাড়,
তবুও একবিন্দু নেই কষ্ট,
আমি যে পাহাড়ে হাঁটতে হাঁটতে অভ্যস্ত।

চিম্বুকে ম্রোদের জুমক্ষেতে,
পাকা ধানের সোনালী রঙের সৌন্দর্যে,
জুমফুলের সুবাসে,
নতুন ধানের সুগন্ধে,
টিয়া পাখির কলকাকলিতে,
নতুন রূপে ভরে ওঠে জুম পাহাড়।

শীতের আগমনে,
নতুন রূপের সৌন্দর্যে এক মায়াবী পাহাড়।
কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ
শিশির ভেজা সবুজ ঘাস
মৃদু মৃদু বাতাসের হাওয়ায়
গাছের পাতা নড়াচড়ায়
সকালে সূর্য ওঠে মিষ্টি হেসে
অপরূপ মায়ায় ভরা
তুলনাহীন রূপের বাহার,
আমাদের এই পাহাড়।

একঝাঁক প্রজাপতি ছুটে চলে,
এই পাহাড়ের বুকে,
অধিকারহারা মানুষের গল্প শুনতে,
পাহাড়ের আর্তনাত শুনতে,
বঞ্চিত-অত্যাচারিত খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গী হতে,
ম্রোদের প্লুং বাঁশির সুর মিলাতে।

একমুঠো খাবারের তাগিদে,
ভোর থেকে সূর্যাস্ত ছুটে চলা জুম পাহাড়ের বুকে।

তৃষ্ণা মিটে ঝিরির ঠান্ডা কুয়ার জলে
একটু বিন্দু নিঃশ্বাস আর একবিন্দু সুখের আশায়
ছুটে চলা এই পাহাড় থেকে ঐ পাহাড়ে।

প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার,
এ কী কঠিন সংগ্রাম!
নির্জন পাহাড়ের চূড়ায়
মৃদু মৃদু বাতাসের ঠান্ডা হাওয়ায়
ছোট্ট এক জুমঘরে নিরবে বসে
শুনতে পাই জুম পাহাড়ের-
অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানুষের হাহাকার, চিৎকার;
শুনতে পাই,
জরাগ্রস্ত মানুষের বুকভরা কষ্টের কান্না।

নিরবে বোবা কান্না, তবুও পড়ি না ভেঙে
লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে
বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো বলে,
জুম পাহাড়ের বুকে বিপ্লব ঘটাবো বলে।

হবে একদিন, হবে যে অবশ্যই-ই!

কুর্নিকোভা চাকমা

সেইদিন ভর দুপুরবেলা,
সবুজ জীপ কয়েক, আমাদের বাড়িসুদ্ধ ধুলোয় উড়িয়ে,
বাগানের কলাবতীটির মাথা মুড়িয়ে,
বিকট শব্দে কানের পর্দায় তালা লাগিয়ে দিয়ে গেল।
বুঝলাম, কিছু একটা নড়বড়ে হতে চলেছে।
সেইদিন সকালবেলা,
ভারি বুটের শব্দে আমাদের বাবুটা কেঁদে উঠল, ভয়ে, আতঙ্কে।
বুঝলাম, তুফান আসতে আর বেশি দেরি নেই।
সেইদিন সকাল সকাল,
খাকিপড়া, ঐ ভারি বুটের মালিকেরা, চকচকে হাতিয়ার হাতে, হাটে আসতেই চারদিকে কলরব পড়ে গেল।
বুঝলাম, আমাদের আনন্দে শকুনের কুনজর পড়ে গেছে।
সেইদিন, তারা জোর করে আমাদের ধলাচানকে টেনে নিয়ে গেল, কারণ তাদের নাকি ইচ্ছা জেগেছে ছাগলের মাংস খাওয়ার।
ধলাচান আর আমাদের বাবুটা সমবয়সী ছিল; ইজোরের মাথায় একটি মানুষের বাচ্চা আর একটি ছাগলের বাচ্চার আনমনা খেলা দেখতে ভালোই লাগত।
তাকে হারিয়ে আমাদের বাবুটা একা গোমড়া হয়ে পড়ল;
বুঝলাম, পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেল বলে।
তা-ও,
শুনেও না শোনার, বুঝেও না বোঝার ভান ধরে,
যে যার কাজে মন দিলাম।
জুমে ধোঁয়া দেয়া হলো,
ইজোর মজবুত করা হলো,
মা-বাবা মিলে বাবুটার জন্য নতুন দোলনা বানানো হলো।
কিন্তু আবারো সেইদিন,
জলপাই রঙের গাড়িতে, ভারি বুটওয়ালারা আমাদের ভিটে দেখিয়ে কি জানি একটা গম্ভীর আলোচনা করে গেলেন।
গভীর রাতে, আমাদের বাবুটা কেঁদে উঠল,
উড়নচণ্ডী হাওয়া চারিদিকে উৎপাত ছড়াল,
রাতের পাখিটি মরাকান্না জুড়ে দিল,
বুঝলাম, ঠিক থাকার জো আর রইল না।
পরেরদিন সকালে,
বাড়ির জিনিসপত্র বের করে দেয়া হলো,
বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়া হলো,
ভিটে গুড়িয়ে দেয়া হলো।
বাবুর মা কেঁদে কেঁদে বলে উঠল, "ভেঙো না, দয়া করো। আমাদের বাড়ি, আমাদের আশ্রয়, আমাদের এই ভিটে, এই জুম, জুমের কচি ধানগাছ, তোমাদের দিলে কি দয়ামায়া নেই একটুও?"
আমাদের বাবুটাও কেঁদে-তেঁদে কাহিল হয়ে পড়ে রইল।
ভিটেটা যেন নগ্ন হয়ে পড়ে আছে, আমার, আমার বাপ-দাদার অনেক সাধের ভিটে;
জানি অশ্রু তার-ও ঝরছে, বুক তার-ও ফাটছে।
দু'চোখ ভিজালাম না একমাত্র আমিই।
আমার সাজানো বাসা ভেঙে দিল,

বাবুটার নতুন দোলনা ছুঁড়ে ফেলে দিল,
সহাস্য একটি পরিবারকে বিদীর্ণ করে ফেলল, মুহূর্তেই।
তবুও আমি কাঁদছি না।
হার আমি মানছি না।
বুকে গড়া আশার বাঁধ,
ভেঙে যেতে দিচ্ছি না।
নতুন দিনের স্বপ্ন বুনা,
ছাড়ছি না, থামছি না।
এখনো স্বপ্নে দেখি,
চাঁদনি রাতে ইজোরের মাথায়, ধুধুকে ঢেঙ তুলছি, সেই আমি, আমরা।
চোখের সামনেই যেন দেখতে পাচ্ছি,
জুমের কচি ধান, হাওয়ার তালে মাতাল;
সেই হাওয়া ছুঁয়ে দিচ্ছে, আমাদেরও মনপ্রাণ।
হবে একদিন, হবে যে অবশ্যই-ই!

‘আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত দাবি। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।’

—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

বিশেষ প্রতিবেদন

জেএসএসের জাতীয় সম্মেলন সম্পন্নঃ বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করাসহ ১৮দফা প্রস্তাবাবলী গৃহীত

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তম আন্দোলনে সামিল হউন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৮-২৯ জুলাই ২০২৩ দুইদিন ব্যাপী রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১১তম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জেলা, থানা ও ইউনিয়ন শাখাসমূহ এবং এর সহযোগী সংগঠন- পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম ও গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সাড়ে চার শতাধিক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক যোগদান করেন।

জাতীয় সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট ১২তম কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি পদে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সহ সভাপতি পদে ঊষাতন তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক পদে প্রণতি বিকাশ চাকমা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে শক্তিপদ ত্রিপুরা নির্বাচিত হয়েছেন।

সম্মেলনে বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং উপস্থাপিত সামগ্রিক প্রতিবেদনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনসহ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ, পার্টির সাংগঠনিক অবস্থা, পার্টির ভবিষ্যত কর্মপন্থার উপর আলোচনা হয়। সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পুনরায় আসীন হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হওয়ায় চরম ক্ষোভ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সরকার একদিকে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে তালবাহানা করে চলেছে, অন্যদিকে চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্মস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূল করা এবং অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা হচ্ছে বলে সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ মত ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ আরো বলেন, সরকার সামরিকায়নের নীতিকে বৈধতা দিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জুম্ম

জনগণকে 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত', 'চাঁদাবাজ' ইত্যাদি তকমা দিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে জুম্মদের মধ্য থেকে সুবিধাবাদী, তাঁবেদার ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের দিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত অধিকারকর্মী ও জনগণকে সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে অবৈধ গ্রেফতার, বিচার-বহির্ভূত হত্যা, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে আটক, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণ, ওয়ারেন্ট ছাড়া ঘরবাড়ি তল্লাশি ও ঘরবাড়ির জিনিসপত্র তছনছ, মারধর, হয়রানি ইত্যাদি ফ্যাসিবাদী কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানেও পার্টির কেন্দ্রীয়সহ বিভিন্ন স্তরের বহু নেতাকর্মী মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে অথবা বিচারবহির্ভূত জেল-জুলুম- মিথ্যা মামলা-হত্যার ঝুঁকিতে নিজের বাড়ি ও এলাকা ছেড়ে ফেরারি অবস্থায় জীবনযাপনে পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

সরকারের বিশেষ মহল একদিকে এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে লালন-পালন ও মদদ দিয়ে এলাকায় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে, অপরদিকে সন্ত্রাসী দমনের নামে জনসংহতি সমিতিসহ জুম্ম জনগণের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে এবং সন্ত্রাসী তৎপরতার দায়ভার জনসংহতি সমিতির উপর চাপিয়ে দিয়ে চলেছে। অন্যদিকে সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ নামক একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনে সংগঠিত করে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম, ভূমি বেদখল, নারীর উপর সহিংসতা, রোহিঙ্গাসহ বহিরাগত অনুপ্রবেশ ও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, সাম্প্রদায়িক হামলা ইত্যাদি তৎপরতায় লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে বহিরাগতদের চাকুরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এসব কারণে জুম্ম জনগণ এক নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। সম্মেলনে প্রতিনিধিবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তম আন্দোলনে সামিল হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনে প্রতিনিধিদের আলোচনা-পর্যালোচনার পর বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়-

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করা।

২. তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিধিমালা অতিসত্তর প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট অব্যাহত তাগাদা রাখাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণপূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন করা।

৬. 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসন বাতিল পূর্বক সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র সকল অস্থায়ী ক্যাম্প চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং প্রত্যাহারকৃত জায়গায় পার্বত্য চুক্তিকে লঙ্ঘন করে এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিল করা।

৭. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশ (স্থানীয়), বন ও পরিবেশসহ পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরযোগ্য বিষয়সমূহ কার্যকর করা।

৮. তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় পুলিশবাহিনী গঠনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৯. ভূমি ব্যবস্থাপনার বিধানাবলী প্রণয়নপূর্বক ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদানের মাধ্যমে স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও পরিষদীয় প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের জন্য অধিকতর সংখ্যক কোটা সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বিসিএস ক্যাডার নিয়োগে বাতিলকৃত উপজাতীয় কোটা পুনর্বহাল করা।

১২. তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সাথে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৩. ১৯৫৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি অধিগ্রহণ আইন বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৪. দেশের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনে অধিকতর সামিল হওয়া।

১৫. দেশের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদী তৎপরতা প্রতিরোধ আন্দোলনে অধিকতর শরিক হওয়া।

১৬. দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সারা বিশ্বের আদিবাসী ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে অধিকতর শরিক হওয়া।

১৭. ক্যাম্প সম্প্রসারণ, অবৈধভাবে ইকো-পার্ক ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা, বহিরাগতদের পুনর্বাসন ইত্যাদির নামে জুমভূমিসহ স্থায়ী অধিবাসীদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জায়গা-জমি অধিগ্রহণ ও বেদখলের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৮. ৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত গৃহীত বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী সিদ্ধান্তাবলী প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিশেষ প্রতিবেদন

আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বর্তমান অবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠিত হয়ে আসলেও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক পুনর্বাসন করা হয়নি, পক্ষান্তরে পার্বত্য চুক্তিকে লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালিদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে, 'ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি রিপোর্ট অনুসারে এই ধারাটি 'সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত' হয়েছে। সরকারের রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, 'বর্তমান চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, সংসদ সদস্য, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা-২৯৮-কে গত ১০/১২/২০১৭ তারিখে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। গত ০৫/১০/২০১৮ তারিখে টাস্কফোর্সের ৯ম ও সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।'

অপরদিকে জনসংহতি সমিতির রিপোর্ট অনুসারে এই ধারাটি 'আংশিক বাস্তবায়িত' হয়েছে মাত্র। জনসংহতি সমিতির রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, 'চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী ভারত প্রত্যাগত ১২,২২২ টি পাহাড়ি শরণার্থী পরিবারের ৬৪,৬০৯ জন শরণার্থীকে আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। তবে ৯,৭৮০ পরিবার তাদের ভিটেমাটি ও জায়গা-জমি ফেরৎ পায়নি, ৮৯০ পরিবার হালের গরুর টাকা পায়নি, ৩৬৬ জন প্রত্যাগত শরণার্থীর সর্বসাকুল্যে ২৭,০৭,২৫২ টাকার ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা হয়নি। পূর্বের চাকরিতে পুনর্বহালকৃত ২৬২ জন শরণার্থীর মধ্যে ১৪ জন এখনো জ্যেষ্ঠতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পায়নি। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের গ্রাম হতে স্থানান্তরিত বা বেদখলকৃত ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি বাজার ও ৭টি মন্দির পুনর্বহাল করা হয়নি। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন ফেনী উপত্যকার মাটিরাংগা, মানিকছড়ি ও রামগড় উপজেলায়, মাইনী উপত্যকার দীঘিনালা ও চেঙ্গী উপত্যকার মহালছড়ি উপজেলায় এবং রাংগামাটি পার্বত্য জেলাধীন মাইনী ও কাচলং উপত্যকার লংগদু উপজেলায় অবস্থিত ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম, ভিটে-মাটি ও জায়গা-জমি এখনো সেটেলার বাঙালিদের পুরো দখলে রয়েছে। এ বিধান 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত' হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।'

এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবির থেকে স্বউদ্যোগে ও ১৬-দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত প্রায় ৫৪ হাজার শরণার্থী রেশন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এসব শরণার্থীদের রেশন প্রদানের জন্য ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের সভায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও সে বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

গত ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে টাস্কফোর্সের সর্বশেষ সভা (১০ম সভা) অনুষ্ঠিত হওয়ার চার বছর পর টাস্কফোর্স অতি স্বল্প নোটিশে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সভা ডেকেছে। এতে প্রতিবাদ জানিয়ে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত থাকেনি।

অপরদিকে পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ২নং ধারায় বলা হয়েছে যে, 'সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।'

উক্ত ধারা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ভূমি জরিপ কাজ এখনো শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন প্রথমত ভূমির বিবাদ নিষ্পত্তি করবে, তারপর জরিপের কাজ করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত

হয়েছে এবং ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে তা জারী করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে খসড়া বিধিমালা, ২০১৬ প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়নের কাজ ভূমি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।'

সরকারের উক্ত রিপোর্টে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছে। এড়িয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ মোটেই অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ২০০০ সালে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু হিসেবে কেবলমাত্র ৯৮ হাজার পরিবারকে পরিচিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর তাদেরকে স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

উল্লেখ্য যে, ২৭ জুন ১৯৯৮ তারিখ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় সভায় পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বলতে যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় তা নিম্নরূপ:

'১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্ট হতে ১৯৯২ সনের ১০ আগষ্ট (অস্ত্র বিরতির শুরুর দিন পর্যন্ত) পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) দীর্ঘ অশান্ত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে যে সকল উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে বিবেচিত হবেন।'

১৩-০৯-২০১৪ তারিখে টাস্ক ফোর্স সভায় আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পরিবারদেরকে রেশনসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বলিত কার্যবিবরণী ২৮-০২-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্স সভায় অনুমোদিত হয়। তবে উক্ত সিদ্ধান্ত এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

পার্বত্য চুক্তির পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবির থেকে স্বউদ্যোগে ও ১৬-দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত প্রায় ৫৪ হাজার শরণার্থীদের রেশন প্রদানের জন্য টাস্ক ফোর্সের সভায় আলোচনা হলেও সে বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এভাবেই আজ পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক গঠিত টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্তবলী অবাস্তবায়িত রেখে সরকার কার্যত টাস্কফোর্সকে অথর্ব করে রেখে দিয়েছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৮ম সভা এবং চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা

গত ২০ আগস্ট ২০২৩ জাতীয় সংসদ ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এমপি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির অপর দুই সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া সভায় সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি বাসন্তি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণলায়ের সচিব মো: মশিউর রহমান, মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব ও একজন যুগ্ম সচিব উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিগত ৭ম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির পূর্বের সভায় প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন মোতায়েনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ স্থগিত করা হয়েছিল। উক্ত বিষয়ে পার্বত্য মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোন মতামত পাওয়া যায়নি বলে জানান পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মশিউর রহমান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালাও এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, বর্তমানে ভূমি মন্ত্রী বিদেশ সফরে রয়েছেন। তিনি দেশে ফিরলে ভূমি কমিশনের বিধিমালা চূড়ান্ত করা হবে।

কমিটির বিগত সভায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে কি কি বিষয় ও কার্যাবলী হস্তান্তর করা হয়েছে তা নিরূপণের জন্য পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত কমিটি গঠন ও নিরূপনের উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি। তাই এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ

নেয়ার জন্য ৮ম সভায় পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে আবারো তাগাদা দেয়া হয়েছে।

কমিটির বিগত সভায় পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের উপর মন্ত্রীপরিষদ সচিবের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। উক্ত বৈঠকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমাও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

কমিটির বিগত সভায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ২৭টি পদ বিশিষ্ট অর্গানোগ্রাম অনুসারে জনবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এখনো অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে আবারো উদ্যোগ নেয়ার জন্য ৮ম সভায় পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে তাগাদা দেয়া হয়েছে।

টাস্কফোর্সের সভা অচিরেই অনুষ্ঠিত করা এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য ৮ম সভায় টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে তাগাদা দেয়া হয়।

জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এখনো যথাযথ কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে অতি সম্প্রতি পার্বত্য মন্ত্রণালয় থেকে জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান পার্বত্য সচিব মো: মশিউর রহমান।

পরিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় বান্দরবান জেলার ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে কেএনএফের বিষয়ে প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এবং ভারত-প্রত্যাহত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স বর্তমান সরকারের আমলে পুনর্গঠিত হয়ে আসছে বটে, কিন্তু এসব কমিটির সভা অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমনকি অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নেও কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ নেয়নি সরকার। উল্টো সরকারকে কমিটির সিদ্ধান্তের বিপরীতে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়।

চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু ২৬ বছরেও পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান অর্জিত হয়নি। যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত

হয়নি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা। সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়নি। পার্বত্য চুক্তি-পূর্ব অবস্থার মতো এসব বিষয়সমূহ এখনো জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার ও সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীরা এখনো নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। পূর্বের মতোই পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো 'উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার' উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রয়েছে। এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব, তাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা এবং এতদাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যতার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ফলে বিগত ২৪ বছরেও পার্বত্য সমস্যার কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমাধান হওয়া তো দূরের কথা, পার্বত্য সমস্যা আরো জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকার গত ২০০৯ সাল থেকে ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়েও বর্তমান সরকার পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ তো গ্রহণ করেইনি, অধিকন্তু গোয়েবলসীয় কায়দায় অব্যাহতভাবে অসত্য তথ্য প্রদান করে চলেছে। চুক্তি বাস্তবায়নে নিজেদের ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিতে বর্তমান সরকার এই মর্মে অসত্য ও একতরফা তথ্য প্রচার করে আসছে যে, চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৮টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ২৯টি ধারা সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে এবং সরকার এসব ধারা অব্যাহতভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে। বিশেষ করে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো হয় আংশিক বাস্তবায়ন করে অথর্ব অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে, নয় তো সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে পাশ কাটিয়ে তথা পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত/অবাস্তবায়িত চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা মূল্যায়ন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ১০ সদস্যক আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে আইন ও বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একজন করে কর্মকর্তা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে চারজন কর্মকর্তা রয়েছেন।

এই কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অন্যতম পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কোন প্রতিনিধি রাখা হয়নি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের মূল দায়িত্ব হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হচ্ছে কমিটির আহ্বায়ক এবং জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও চুক্তি মোতাবেক গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হচ্ছেন কমিটির সদস্য। পার্বত্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও চুক্তির সরাসরি বরখেলাপ। সরকারের পার্বত্য চুক্তিকে পদদলিত করার ক্ষেত্রে আরেকটি অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি। আরো হাস্যকর বিষয় যে, ২০১৪ সাল থেকে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হলেও আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে ৭২টি ধারার মধ্যে পূর্বের বাস্তবায়িত ৪৮টি ধারার সাথে আরো ১৭টি ধারা বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে খুঁজে পেয়েছে। ফলে চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মতে ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আর মাত্র ৭টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

৭টি 'আংশিক বাস্তবায়িত' বা 'বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান' ধারাগুলোর মধ্যে 'খ' খন্ডের ১৯ নং ধারা (উন্নয়ন সংক্রান্ত), ২৪ নং (পুলিশ নিয়োগ) ও ২৬ নং (জায়গা-জমি হস্তান্তরে বিধিনিষেধ); আর 'ঘ' খন্ডের ২ নং (ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং ভূমি জরিপ), ৩ নং (ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী), ৪ নং (ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি) ও ১৭ নং ধারা (ক্যাম্প প্রত্যাহার) রয়েছেন বলে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ছিল বিভ্রান্তিকর ও মনগড়া। বস্তুত পার্বত্য চুক্তির কোন কোন ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে বা হয়নি তা নির্ধারণ করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে তা করা উচিত বলে বিবেচনা করা যায়।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে জনসংহতি সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে গত ১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ' সম্বলিত ১৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন এবং তৎসঙ্গে সহায়ক দলিল হিসেবে ১৬টি পরিশিষ্ট সংযুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট জমা দেয়া হয়েছে। গত ২০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

কমিটির সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক পেশকৃত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সংক্রান্ত' শীর্ষক প্রতিবেদনে সরকারের সর্বশেষ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন আরেকবার সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে পূর্বের মতো একতরফা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম বিষয়সমূহ হচ্ছে-

- পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদিসহ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তর করা;
- পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠন করা।
- নির্বাচন বিধিমালা ও স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন পূর্বক আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা;
- 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসনসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা;
- ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে বেদখল হওয়া জায়গা-জমি জুম্মদের নিকট ফেরত দেয়া;
- ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন প্রদান করা;
- অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিল করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা;
- চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন, ১৯২৭ সালের বন আইন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান করা ইত্যাদি।

পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো সামরিক উপায়ে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। তদুদ্দেশ্যে কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে ২০টির অধিক ক্যাম্প পুনঃস্থাপন করা হয়েছে এবং পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে জুম্ম জনগণের উপর ফ্যাসীবাদী কায়দায় সামরিক অভিযান চালানো হচ্ছে। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত ব্যক্তি ও সংগঠনকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত' হিসেবে পরিচিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জুম্ম জনগণের উপর সেনা অভিযান, ঘরবাড়ি তল্লাশি, গ্রেফতার, ক্রশফায়ারের নামে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের, অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল, চুক্তি বিরোধী অপপ্রচার ইত্যাদি মানবতা ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

অপরদিকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে, সর্বোপরি জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্ব কর্তৃক সৃষ্ট সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফ, জেএসএস (এম এন লারমা) সংস্কারপন্থী, ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক), মগ পার্টি, আরএসও, আরসাসহ পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও মৌলবাদী জঙ্গীগোষ্ঠীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ'-এর ব্যানারে সংগঠিত করে মুসলিম সেটেলার, উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে ভূলুণ্ঠিত করে সত্তর দশকের মতো জুম্ম জনগণকে আবারো দূরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করতে বর্তমান সরকার আজ উঠেপড়ে লেগেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে সামরিক উপায়ে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র বিশ্বের কোন দেশেই শুভ ফল বয়ে আনেনি। দেশের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে জাতিগত নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্রও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কোন শুভ ফল বয়ে আনেনি তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের এক-দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন, দমন-পীড়ন, নির্যাতন-নিপীড়ন ও জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র জারি রেখে দেশে কখনোই প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার যথাযথ রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের কোন বিকল্প নেই তা দেশের শাসকগোষ্ঠী যতই দ্রুত উপলব্ধি করতে পারবে, ততই দ্রুত দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

সংবাদ প্রবাহ

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন জুম্মকে মারধর

গত ১ জুলাই ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার জুরাছড়ি সদরের রাস্তামাথা এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন নিরীহ জুম্ম যুবক বেদম মারধর ও হয়রানির শিকার হয়। জানা যায়, গত ১ জুলাই ২০২৩ রাত আনুমানিক ১০ টার দিকে বাড়িতে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর সুজন খীসা, সত্তম চাকমা ও বিকাশ চাকমা তাদের এলাকার আরও দুই কিশোর সত্য বিকাশ চাকমা (১৫) ও সত্য আলো চাকমাসহ পাঁচজনে একসঙ্গে বাড়ির পার্শ্ববর্তী হাঙারাছড়ি সেতুতে হাওয়া খেতে যায়।

এরপর রাত ঠিক ১১ টার দিকে বনযোগীছড়া সেনা জোনের জোন কমান্ডার মোঃ জুলকিফলী আরমান বিখ্যাত (পিএসসি) এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়। এসময় জোন কমান্ডার মোঃ জুলকিফলী আরমান বিখ্যাত (পিএসসি) হাঙারাছড়ি সেতুতে থাকা জুম্ম যুবক ও কিশোরদেরকে 'বাড়ি কোথায়, এত রাতে এখানে কী করছ, কী করেন' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এক পর্যায়ে জোন কমান্ডার সুজন খীসা, সত্তম চাকমা ও বিকাশ চাকমাকে গালে থাপ্পর মারেন এবং গাছের গুঁড়ি দিয়ে অমানবিকভাবে মারধর করেন। মারধর করার পর জোন কমান্ডার আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আকাশের দিকে তিনবার গুলি ছুঁড়ে সেনাদলটি নিয়ে জুরাছড়ি সদরের দিকে রওনা দেন।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই যুবকে আটক ও মারধর

গত ৭ জুলাই রাত আনুমানিক ৭ টার দিকে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুরাছড়ি উপজেলা সদর এলাকার শান্তি চাকমা (২৪), পীং-মারাঙ্গে চাকমা এবং রুবেল চাকমা (১৫), পীং-শান্তিরাজ চাকমাকে মারধর ও হয়রানি করা হয়েছে। তাদের উভয়ের বাড়ি জুরাছড়ি উপজেলা সদর এলাকার আনন্দপাড়া (লেবার পাড়া) গ্রামে বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৭ জুলাই ২০২৩ সন্ধ্যার দিকে ভুক্তভোগী দুই জুম্ম যুবক তাদের গ্রামের পার্শবর্তী ভদ্রমাছড়া নামক একটি ছড়াতে কাঁকড়া ধরতে যায়। রাত অনুমানিক ৭ টার দিকে বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে ১০-১৫ জনের একটি সেনাদল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। এসময় সেনা সদস্যরা কাঁকড়া ধরারত ২ জুম্ম যুবককে সেখান থেকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে সেনা সদস্যরা ঐ জুম্ম যুবকদের অন্যায়ভাবে ব্যাপক মারধর করে এবং প্রায় দুই ঘন্টা সাময়িক আটক রেখে হয়রানি করে।

পরে ভুক্তভোগী দুই যুবকের অভিভাবক ও গ্রামের মুরুব্বিরা সেনা ক্যাম্পে গিয়ে ওই দুই নিরপরাধ যুবককে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালে রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে সেনাবাহিনী তাদেরকে ছেড়ে দেয় বলে খবর পাওয়া যায়।

বাঘাইহাটে সেনাবাহিনী কর্তৃক মোটর সাইকেল চালককে ধরে পুলিশের নিকট সোপর্দ

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের গত ১৩ জুলাই ২০২৩ দুপুর ১টার সময় বাঘাইহাট বাজার থেকে সেনাবাহিনীর কর্তৃক এক পাহাড়ি মোটর সাইকেল চালককে আটকের পর থানায় হস্তান্তরের অভিযোগ পাওয়া যায়।

আটক ব্যক্তির নাম সুমেট চাকমা (৩৫) পিতা- বাদি চাকমা, গ্রাম- দোজরী হাগলাছড়া, ৪নং ওয়ার্ড, সাজেক ইউনিয়ন। পেশায় তিনি ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালক।

জানা যায়, সুমেট চাকমা দীঘিনালা থেকে একজন যাত্রী নিয়ে বাঘাইহাট বাজার স্টেশনে পৌঁছালে সেখানে থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকে আটক করে সেনা জোনে নিয়ে যায়। প্রায় ৩ ঘন্টা জোনে আটকের পর বিকালে তাকে সাজেক থানায় হস্তান্তর করা হয়।

বরকল বিজিবি কর্তৃক ধর্মীয় গুরুসহ অস্থানীয়দের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

গত ১৩ জুলাই ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের এরাবুনিয়া বিজিবি ক্যাম্প কর্তৃক ক্যাম্পের পরবর্তী উপরের এলাকায় ধর্মীয় গুরুসহ ও অস্থানীয়দের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

উক্ত বিজিবি ক্যাম্পের উপরের এলাকায় কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু, মৌলভী, ফাদার বা ধর্ম পূজারিসহ অস্থানীয় কেউ যেতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ। ১২ বিজিবি ছোট

হরিণা জোনের অধীন এরাবুনিয়া ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা পোস্টার ও সাইনবোর্ডের মাধ্যমে তাদের এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়ে দেয়।

লক্ষ্মীছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬ জন থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ

গত ১৮ জুলাই ২০২৩ খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলাধীন ৩নং বর্মাছড়ি ইউনিয়নের শুকনাছড়ি এলাকা থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক হেডম্যানসহ ৬ জনের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

যাদের মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয় তারা হলেন- ১. শান্তি মোহন চাকমা (৪৫), (৮৪ নং মুক্তাছড়ি মৌজার হেডম্যান), পিতা-মৃত নিকুঞ্জয় চাকমা ২. উমেশ চাকমা (৪০), পিতা-মৃত মঙ্গলধন চাকমা, ৩. কালায়ন চাকমা (২৮), পিতা-সুদিক্যা চাকমা, ৪. ক্লিনটন চাকমা (২৫), পিতা-কামানি কুমার চাকমা, ৫. কিলিন্যা চাকমা (২২), পিতা- বিন্দু কুমার চাকমা ও ৬. মিন্টু চাকমা। তারা সবাই শুকনাড়ি এলাকার বাসিন্দা।

জানা যায়, গত ১৮ জুলাই ২০২৩ রাত ১০টার সময় লক্ষ্মীছড়ি সদর সেনা জোন থেকে ৪টি গাড়িতে করে একদল সেনা সদস্য শুকনাছড়ি ক্যাম্পে আসার পথে উত্তর শুকনাছড়ি এলাকার একটি দোকানে অবস্থানরত উক্ত ৬ জনের কাছ থেকে কোন কারণ ছাড়াই মোবাইলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মোবাইলগুলো ১৯ জুলাই সকাল ১০টায় ফেরত দেওয়ার কথা থাকলেও সেগুলো ফেরত দেয়া হয়নি।

বাঘাইছড়িতে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা, বাতিলের দাবি

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩০নং সারোয়াতলী ইউনিয়নের ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের এবং ৩৯১ নং চুরাখালী মৌজার জুম্ম এলাকাবাসী তাদের এলাকায় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রকল্প (গেইম সেঞ্চুয়ারি) ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং প্রকল্পটি বাতিলের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বরাবরে স্মারকলিপি দেওয়ার খবর পাওয়া যায়।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরদাতা হেডম্যান ও কার্বারিগণ হলেন- কিরণ বিকাশ চাকমা (হেডম্যান প্রতিনিধি, ৩৯১নং চুরাখালী মৌজা), সুপ্রসাদ চাকমা (কার্বারি), মিলন চাকমা (কার্বারি), অমূল্যসেন চাকমা (কার্বারি), প্রমোদ চাকমা (কার্বারি), নয়ন তারা চাকমা (কার্বারি), শান্তশীল চাকমা (কার্বারি), মৃণা চাকমা (কার্বারি), নীতিময় চাকমা (কার্বারি), চম্পা চাকমা (কার্বারি), কমল কেতন চাকমা (কার্বারি), ধনা চাকমা (কার্বারি), এন্টি চাকমা (কার্বারি), অভিজিৎ চাকমা (কার্বারি)।

জানা যায় যে, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক-এর স্মারক নং- ৩১.৪২,৮৪০০.২২৬.১৯.০৩২.১৪-৭৫৫ তারিখ ২৭/৫/২০১৪ খ্রিঃ মূলে এলাকাটিকে ডি ফরেস্ট করে নতুন মৌজা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে লংগদু উপজেলাধীন ৩৯০নং কালাপাকুজ্যা মৌজা সৃষ্টির পর নব সৃষ্ট মৌজার নম্বর হবে ৩৯১ নং চুরাখালী মৌজা।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বাঘাইছড়ি ও লংগদু উপজেলার অন্তর্গত মোট ৪২ হাজার ৮৭ হেক্টর জায়গা ১৯৬২ সালে কাচালং রিজার্ভের দক্ষিণ পূর্ব অংশকে (গেইম সেঞ্চুয়ারি) বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তন কৃষি মন্ত্রণালয়ের নোটিফিকেশন নং xiii for - ১/৮৩/৬৮২ মূলে সংশ্লিষ্ট মৌজার স্থানীয় এলাকারবাসীর মতামত না নিয়ে একতরফা ভাবে পাবলাখালী (গেইম সেঞ্চুয়ারি) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ বহু বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর বিগত ১৪/০৬/২০২২ইং ও ১৪/০৬/২০২৩ইং তারিখে পরপর দুইবার সংশ্লিষ্ট মৌজার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই বিষয়ে রাঙ্গামাটিস্থ যথাক্রমে ফরেষ্ট অফিস সম্মেলন কক্ষে এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অত্র এলাকায় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে এলাকাবাসীর মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রকল্প ঘোষণার বিরুদ্ধে জোরালো বিরোধীতা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

উক্ত অভয়ারণ্য হলে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ, তাদের ব্যাপক বাগান-বাগিচা ধ্বংসসহ স্থানীয় জুম্মদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হবে বলে উল্লেখ করা হয়। গত ১৯ জুলাই ২০২৩ এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ৩৯১নং চুরাখালী মৌজার হেডম্যান ও কার্বারিগণ রাঙ্গামাটিস্থ আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের বরাবরে এই স্মারকলিপি প্রদান করেন।

রেইক্ষ্যং ভ্যালীর কয়েকটি গ্রামে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান

গত ২৫ জুলাই ২০২৩ রেইক্ষ্যং ভ্যালীর বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়নের থাংকুইটাং ক্যাম্প থেকে জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ৪০ জনের একদল সেনা বড়থলি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সারাল্যাছড়া ও রাইমংছড়ায় হয়রানিমূলক টহল অভিযান চালানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক দেখা দেয়।

সাজেকে ৫ পরিবারকে উচ্ছেদ করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের ৮নং পাড়া নামক স্থানে বিজিবি ক্যাম্প নির্মাণের নামে ৫ পাহাড়ি পরিবারকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যায়।

ক্যাম্প স্থাপনের ফলে যারা উচ্ছেদের শিকার হবেন তারা হলেন- ১. সুপ্রিয় চাকমা, পিতা- মনু রঞ্জন চাকমা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ফলজ বাগান ৩ একর; ২. রিটেন চাকমা, পিতা- গৌতম চাকমা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আম, কাঠাল, লিচুসহ ৪ একর; ৩. পুষ্পলতা চাকমা (বিধবা), ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ফলজ বাগান ২ একর; ৪. কমল বিকাশ চাকমা, পিতা- ভালুক্য চাকমা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আম, কাঠাল, কাজু বাদাম চারাসহ ২ একর ও ৫. স্মৃতি বিকাশ চাকমা, পিতা- সুর্য মোহন চাকমা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ফলজ বাগান ৫ একর জায়গা।

জানা যায়, গত ২৫ জুলাই ২০২৩ দুপুরে রুইলুই পাড়া বিজিবি ক্যাম্প থেকে ১০-১২ জনের একদল বিজিবি সদস্য ৮নং পাড়া এলাকায় যায়। এ সময় বিজিবি দলটির কমান্ডার জনৈক সুবেদার পাড়ার কার্বারী খুলোমনি চাকমাকে ডেকে বলেন, 'আমরা এখানে একটি ক্যাম্প নির্মাণ করতে চাই'। এর পরপরই বিজিবি সদস্যরা জঙ্গল পরিষ্কার করতে থাকলে এক পর্যায়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা এর প্রতিবাদ করলে গ্রামবাসীদের সাথে বিজিবি সদস্যদের সাথে বাকবিতণ্ডা হয়। কিন্তু তারপরও বিজিবি সদস্যরা জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ বন্ধ করেনি।

সাজেকে সেনা ক্যাম্প স্থাপনে জুম্ম নারীদের বাধা প্রদান

গত ৪ আগস্ট ২০২৩ সকালে সেনাবাহিনীর ২০-২২ জনের একটি দল ৮নং পাড়ায় গিয়ে সেনা ক্যাম্প স্থাপনের চেষ্টা করলে স্থানীয় নারীরা তাদের প্রতিরোধ করে। এ সময় নারীরা মোবাইলে ভিডিও ধারণ ও ছবি তুললে সেনারা ওই সব মোবাইল কেড়ে নিয়ে ধারণকৃত ভিডিও, ছবি ডিলিট করে দেয়। পরে মোবাইলগুলো ফেরত দিয়ে সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায় বলে স্থানীয়রা জানান।

এর আগে গত ২৫ জুলাই রুইলুই সেনা ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য ৮নং পাড়ায় গিয়ে পাড়াবাসীদের আপত্তি উপেক্ষা করে নতুন একটি সেনা ক্যাম্প স্থাপনের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করে। যে স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় সেখানে পাহাড়িদের ফলজ বাগান-বাগিচা ও বসতি রয়েছে বলে জানা যায়।

দুরছড়ি ক্যাম্পের একদল সেনা কর্তৃক শিজকে টহল অভিযান

গত ১৬ আগস্ট ২০২৩ সকালের দিকে দুরছড়ি বাজার সেনা ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনী ও আনসার এর আনুমানিক ২০-২৫ জনের একটি দল ট্রলার বোট যোগে অত্যাধুনিক বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে শিজক দোর ঘাটে এসে থামে। সেখান থেকে তারা পায়ে হেঁটে বটতলা হয়ে লাম্বাছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান গ্রহণ করে এবং সারা রাত সেখানে থাকে।

পরের দিন ১৭ আগস্ট ২০২৩ সকাল আনুমানিক ১১ টার দিকে উক্ত সেনাদলটি লাম্বাছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করে শিজকমুখ বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে অবস্থিত পরিত্যক্ত সেনা ক্যাম্পে অবস্থান গ্রহণ করে। সেখানে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর, বিকাল ৪ টার দিকে উক্ত সেনাদলটি আবার দুরছড়ি সেনা ক্যাম্পে ফিরে যায় জানা যায়।

আলিকদমে সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ দুই ম্রো জুমচাষীকে মারধর

গত ২৬ আগস্ট ২০২৩ বান্দরবান জেলাধীন আলিকদম উপজেলার সদর ইউনিয়নের সাংপায়া পাড়ায় রাংরেং ম্রো (২৭), পীং-মাংসাই ম্রো এবং মাংনৈং ম্রো (৩২), পীং-বানোয়া ম্রো নামে দুই নিরীহ জুম্ম জুমচাষী সেনাবাহিনীর অমানুষিক মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, এখন পাহাড়ে জুমের ধান পাকার মৌসুম। ফলে এই সময়ে জুমে জুমে বন্য শূকরের পাল ও বানরের দল এসে ফসল নষ্ট করে থাকে। সেকারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক জুমচাষী প্রায়ই নিজেদের তৈরি গাদা বন্দুক দিয়ে জুমে পাহারা দিয়ে থাকে। ফসল রক্ষার এই নিয়ম বহুদিন আগে থেকে চলে আসছে।

ঐদিন সকাল বেলায় ভুক্তভোগী রাংরেং ম্রো ও মাংনৈং ম্রো নিজেদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী জুমে গিয়েছিলেন গাদা বন্দুক নিয়ে। এই সময় জুমে শূকর এলে তারা গাদা বন্দুক দিয়ে গুলি

করে। এই গুলির শব্দ শুনে পার্শ্ববর্তী দোছড়ি বাজার সেনা ক্যাম্পের সেনাবাহিনীর ১০-১২ জনের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং রাংরেং ম্রো ও মাংনৈং ম্রোকে সেনা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। সেনা ক্যাম্পে দুই জুমচাষীকে ব্যাপক মারধর করা হয়। গুলি করতে হলে সেনাবাহিনীর অনুমতি লাগবে বলে জানায় সেনা ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ।

জুরাছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সীমানা দেয়াল নির্মাণে সেনাবাহিনীর বাধা

গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ সকালের দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজে সেনাবাহিনী বাধা প্রদান করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবন ও এর সীমানা দেয়াল নির্মাণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে দরপত্র আহ্বান করা হলে সেখানে বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এতে ইউ টি মং নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি কাজটি পায়। তারপর ইউ টি মং নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ শুরু করে। প্রথমে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সীমানা দেয়ালের কাজ শুরু করা হলে স্থানীয় জুড়াছড়ি সেনা ক্যাম্পের সেনাবাহিনী বাধা প্রদান করে।

জানা যায়, বাধা প্রদানের মুল কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জায়গার সীমানায় ৭টি বাঙালি পরিবারের অবৈধ বসবাস রয়েছে। এখন সীমানা দেয়াল যদি দেওয়া হয় নিয়ম অনুযায়ী অবৈধভাবে বসতকারী বাঙালিদের সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে হবে।

জুরাছড়ি উপজেলা ভবন নির্মাণে সেনাবাহিনীর বাধা প্রদান

গত ২৯ আগস্ট ২০২৩, দুপুরের দিকে স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, জুরাছড়ি সদরে উপজেলা ভবন নির্মাণের কাজেও জুরাছড়ি সেনা ক্যাম্পের সেনা কর্তৃপক্ষ বাধা প্রদান করে।

সূত্রটি জানায়, জুরাছড়ি উপজেলা ভবন নির্মাণে এলজিইডি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হলে বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করে। তবে এদের মধ্যে কাজটি করার চূড়ান্ত অনুমোদন পায় মেসার্স ইউ টি মং নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পর, মেসার্স ইউ টি মং নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে উপজেলা ভবন নির্মাণ কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে সেনবাহিনী ভবন নির্মাণ কাজে বাধা দেয় এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক উপজেলা ভবন নির্মাণ কাজে বাধা দেয়ার বিষয়টি স্বয়ং উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ মতিউর রহমান ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক মোঃ হোসাইন জুরাছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যানকে অবহিত করেছেন বলে জানা যায়।

নান্যাচরে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের ২টি বাড়ি তল্লাশি

রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার সদর ইউনিয়নের সাপমারা গ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই গ্রামবাসীর বাড়িতে হয়রানিমূলক তল্লাশি চালানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। তল্লাশির শিকার গ্রামবাসীরা হলেন- কুনেন্দু বিকাশ চাকমা (৬৫), পিতা-মৃত হেম রঞ্জন চাকমা ও জগৎ জ্যোতি চাকমা (৫৫), পিতা- ঐ। তারা দু'জনই আপন ভাই।

জানা যায়, গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ভোররাত ৩টার সময় নান্যাচর সেনা জোন থেকে দুটি ইঞ্জিনচালিত বোট যোগে একদল সেনা সদস্য দু'জন পুলিশ ও দু'জন সেনা-মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীকে সাথে নিয়ে সাপমারা গ্রামে হানা দেয়। সেনারা প্রথমে কুনেন্দু বিকাশ চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে বাড়ির ঘুমন্ত লোকজনকে জাগিয়ে বাড়ি থেকে বাইরে বের হতে বলে। লোকজন বাইরে বের হলে পরে সেনারা বাড়িতে প্রবেশ করে হয়রানিমূলক তল্লাশি চালায়। এরপর একই কায়দায় সেনারা পার্শ্ববর্তী তার ভাই জগৎ জ্যোতি চাকমার বাড়িতেও তল্লাশি চালায়।

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক একজন জুম্মকে গ্রেফতার

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পেরাছড়া থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক অমর জ্যোতি দেওয়ান (৪৮), পীং- ব্রজ কুমার দেওয়ান, গ্রাম- হরিনাথ পাড়া নামে একজন গ্রামবাসীকে আটকের অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, গত ৩ সেপ্টেম্বর বেলা ২:৩০ সময় খাগড়াছড়ি সদর জোনের একদল সেনা সদস্য পেরাছড়া এলাকায় হানা দেয়। এ সময় সেনারা কোন কারণ ছাড়া অমর জ্যোতি দেওয়ানকে আটক করে নিয়ে যায়।

লংগদুতে ত্রাস সৃষ্টির জন্য সেনাবাহিনী কর্তৃক বেপরোয়া গুলিবর্ষণ

রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার আটরকছড়া ইউনিয়নে জুম্মদের গ্রাম লক্ষ্য করে সেনাবাহিনী বেপরোয়াভাবে ব্যাপক ফাঁকা গুলিবর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া

পরে সেনা সদস্যরা গ্রামের লোকদের হয়রানি এবং হুমকি প্রদান করেছে বলে জানা যায়।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ৯:৩০ টার দিকে আটরকছড়া ইউনিয়নে অবস্থিত 'তেজস্বী বীর করল্যাছড়ি সাব-জোন'এর সেনা সদস্যরা ক্যাম্পের পূর্ব ও উত্তরদিক বরাবর জুম্মদের বসতি লক্ষ্য করে বেপরোয়াভাবে কমপক্ষে ১০০-১৫০ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এতে আশেপাশে থাকা জুম্মদের বসতবাড়িতে গিয়ে গুলি পড়ে। এসময় স্থানীয় জুম্মদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

এর পরদিন ১৭ সেপ্টেম্বর ভোর ৬টার দিকে করল্যাছড়ি সাব-জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর রিফাত-এর নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি সেনাদল করল্যাছড়ি গ্রামে প্রবেশ করে এবং ১৫/১৬ জন গ্রামবাসীকে ধরে এনে এক জায়গায় জড়ো করে। এসময় গতকাল রাতে কে বা কারা সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের উদ্দেশ্য করে একটি ফায়ার করলে সঙ্গে সঙ্গে সেনা ক্যাম্প থেকেও ব্রাশ ফায়ার করা হয় বলে গ্রামবাসীদের সামনে উল্লেখ করেন মেজর রিফাত। এসময় মেজর রিফাত ওই গুলি বর্ষণের জন্য উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে জেএসএসকে দায়ী করেন।

রুমায় সেনাবাহিনীর গুলিতে কথিত একজন কেএনএফ সদস্য আহত

বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলা সদরের জায়ন পাড়াতে চাঁদাবাজির সময় সেনাবাহিনীর গুলিতে ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠী আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের এক সশস্ত্র সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে রুমা সদরের জায়ন পাড়াতে বম পার্টি নামে খ্যাত কেএনএফ সন্ত্রাসীদের ৬ জন সশস্ত্র সদস্য রুমা বাজারে চাঁদা নিতে আসে এবং বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে চাঁদাও আদায় করে নেয় তারা।

পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর কাছে এই খবর পৌঁছালে তাদেরকে ধরার জন্য সেনাবাহিনীর একটি দল রুমা বাজার এলাকা ঘেরাও করে। পরে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে তারা সেনাবাহিনীর উপর গুলি চালায়। একপর্যায়ে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা জায়ন পাড়ার পার্শ্ববর্তী রাস্তায় পৌঁছলে সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য করে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ৫ রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। এতে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের বয়রামসাঙ বম (২২), পীং: জারেমলাল বম নামে ১ জন সশস্ত্র সদস্য গুলি লেগে আহত হন এবং বাকিরা পালাতে সক্ষম হন বলে জানা যায়। বয়রামসাঙ বমকে আহত অবস্থায় সেনাবাহিনীরা রুমা জোনে নিয়ে গেছে বলে জানা যায়।

রাঙ্গামাটির মগবানে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান

রাঙ্গামাটির সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক হয়রানিমূলক টহল অভিযান চালানোর খবর পাওয়া যায়। জানা যায়, গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মগবান ইউনিয়নের গবঘোনা সেনা ক্যাম্প হতে সুবেদার মোঃ সাইফুল এর নেতৃত্বে দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় মগবান ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডে আনসারসহ ২১ জনের একটি টহল দল ট্রলার যোগে গড়াকাবা গ্রামে জ্ঞান লাল চাকমার বাড়ির নিকটবর্তী পাড়া কেন্দ্রে এসে অবস্থান নেয়।

সেদিন পাড়া কেন্দ্রে অবস্থানের পরদিন ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সকাল ৯ টার দিকে গড়গজ্যাছড়ি গ্রামের সম্ভূ লাল চাকমার বাড়ি পর্যন্ত ঘুরে এসে সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় গবঘোনা সেনা ক্যাম্পে চলে যায়।

রাঙ্গামাটির বালুখালীতে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটির সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের মরিচ্যাবিল সেনা ক্যাম্প হতে ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনা টহল দল ট্রলার যোগে দুপুর ২ টার সময়ে বালুখালী ইউনিয়নের বসন্ত এলাকায় টহল অভিযান চালায়। এক পর্যায়ে সেনা সদস্যরা বসন্ত জুনিয়র হাই স্কুলে অবস্থান নেয়।

সেদিন রাত ৯ টার দিকে স্কুলের আশেপাশে ঘুরে আবার তাদের অবস্থানে ফিরে যায় এবং পরদিন ২২ সেপ্টেম্বর সকাল ১১ টার দিকে ক্যাম্পে ফিরে যায় বলে জানা যায়।

পানছড়িতে বিজিবি কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর ঋণের টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার পুজগাঙ এলাকায় এক পাহাড়ি কর্তৃক ঋণের টাকা পরিশোধ করতে যাওয়ার সময় বিজিবি কর্তৃক টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় বিজিবি ও এলাকাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে এক বিজিবি সদস্য কর্তৃক জনতার উপর গুলি করলে একজন আহত হন। এছাড়া বিজিবি কর্তৃক আরেকজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা যায়।

জানা যায়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকাল ৪ ঘটিকার সময় বিজিবি কর্তৃক এক ব্যবসায়ীর ঋণ পরিশোধের জন্য পাঠানো ১২ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে এক ব্যক্তিকে আটকের চেষ্টা করলে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

এতে মিকেল চাকমা (২৪) নামে একজন আদিবাসী যুবক পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। এছাড়া পানছড়ির পুজগাঙ ইউনিয়নের দুর্গামনি পাড়ার অমিয় চাকমা ছেলে পুর্ণ রতন চাকমা (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে বিজিবি।

পরে গত ২৫ সেপ্টেম্বর লোগাং বিজিবি ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরো ৫০০/৬০০ জনকে আসামি করে পানছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করে। লোগাং বিজিবি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার মো: মোফাজ্জল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলার ধারা-১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩৭৯ পেনাল কোড।

কাপ্তাই-রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল সংযোগ সড়কে ৩৫ পরিবারের ক্ষতি সম্মুখীন

কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে স্থানীয় জুম্ম গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ি, বাগান-বাগিচা, জায়গা-জমি ধ্বংস করে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই-রাজস্থলী-বিলাইছড়ি- জুরাছড়ি-বরকল (ঠেগামুখ) সংযোগ সড়কের অংশ হিসেবে কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালীর কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত ৪০ কি:মি: সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ চলছে।

বর্তমানে বিলাইছড়ির সীমান্তবর্তী ৪নং কাপ্তাই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের গাছকাবা ছড়াতে কাজ চলমান রয়েছে। সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ঠিকাদারের মাধ্যমে এই সংযোগ নির্মাণ করা হচ্ছে বলে জানা যায়। ক্ষতির সম্মুখীন ৩৫টি পরিবারের আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা বলে জানা যায়।

এলাকাবাসীর মাধ্যমে জানা যায়, ৪৩ ফুট প্রশস্ত এই সংযোগ সড়কটি নির্মাণের ফলে স্থানীয় জুম্মদের বিভিন্ন ধরনের বাগান-বাগিচা, হলুদ ক্ষেত ও ইউনিসেফ পাড়া কেন্দ্র সহ অন্তত ৩৫টি জুম্ম পরিবার ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। কিন্তু তাদেরকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে কন্ট্রাক্টর কামাল ও ইঞ্জিনিয়ারের সাথে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিগণ আলোচনা করতে চাইলে তারা পরিষ্কারভাবে বলে দেন যে, তারা কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না। এলাকাবাসী কাজে বাধা প্রদান করলে, তারা সেনাবাহিনী এনে কাজ চালিয়ে যাবেন বলেও হুমকিমূলক কথা বলেন।

বাঘাইছড়িতে বিজিবি কর্তৃক একজন জুম্ম কাঠ বিক্রেতার সেগুন কাঠ জব্দ

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতলী ইউনিয়নে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা বেআইনিভাবে রাঙায়্যা চাকমা, পীং-শরত্যা চাকমা, গ্রাম-চিন্তারাম ছড়া, ৫নং ওয়ার্ড, ৩০নং সারোয়াতলী ইউনিয়ন নামে একজন জুম্ম সেগুন কাঠ বিক্রেতার নিজস্ব সেগুন কাঠ জব্দ করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। জব্দকৃত সেগুনকাঠের পরিমাণ আনুমানিক ১৫০ ঘনফুট, যার স্থানীয় বাজারমূল্য ১ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, সকাল আনুমানিক ৮ টায় সারোয়াতলী বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার মো: কামাল-এর নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য সারোয়াতলীর চিন্তারাম ছড়া গ্রামে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রাঙায়্যা চাকমার বাড়ি থেকে উক্ত সেগুন কাঠগুলি জব্দ করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। উক্ত কাঠগুলি রাঙায়্যা চাকমার নিজস্ব বাগানের এবং জোত পারমিটের ডি ফরম করা। তিনি এই সেগুন কাঠগুলি নিজের বাড়ির উঠোনে বিক্রির জন্য বিছিয়ে রেখেছিলেন। জানা গেছে, রাঙায়্যা চাকমার এই কাঠগুলি আইনত বৈধ কাঠ।

বরকলে বিজিবি কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর ধান্য জমি জবরদখল

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নে স্থানীয় এক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক আদিবাসী জুম্ম গ্রামবাসীর ধান্যজমি বেদখলের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এনিয়ে ওই গ্রামবাসীকে হুমকি দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী ওই গ্রামবাসীর নাম সোনাধন চাকমা, পীং-বুদ্ধমনি চাকমা, গ্রাম-ঠেগা খুব্বাং, ১নং ওয়ার্ড, ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন। সোনাধন চাকমার পরিবার পাকিস্তান আমল থেকে ওই জমিতে ধানচাষ করে আসছেন। ওই জমির পরিমাণ ০.৬০ একর।

জানা যায়, গত ৫ অক্টোবর ২০২৩ ভূষণছড়া ইউনিয়নের ১২ বিজিবি ছোট হরিণা জোনের অধীন ঠেগা খুব্বাং বিওপি ক্যাম্পের দায়িত্বরত কমান্ডার ক্যাপ্টেন সাদেকী আরফান নিলয় স্থানীয় খুব্বাং এলাকার কার্বারি (গ্রাম প্রধান) শ্যামল কান্তি চাকমাকে তার ক্যাম্পে ডেকে পাঠান। কার্বারি শ্যামল কান্তি চাকমা ক্যাম্পে গেলে ক্যাপ্টেন সাদেকী আরফান নিলয় কার্বারিকে জানান যে, তাদের ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী অবস্থিত সোনাধন চাকমার যে ধান্যজমিটা রয়েছে সেটা আর সোনাধন চাকমাকে চাষ করতে দেয়া হবে না।

এরপর কার্বারি শ্যামল কান্তি চাকমা গ্রামে ফিরে এসে বিজিবি'র সিদ্ধান্তের কথা জমির মালিক সোনাধন চাকমাকে জানিয়ে দিলে সোনাধন চাকমাও ঠেগা খুব্বাং বিওপি ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন সাদেকী আরফান নিলয়ের সাথে দেখা করতে যান।

এসময় ক্যাপ্টেন সাদেকী আরফান নিলয় সোনাধন চাকমাকে বলেন যে, ওই ধান্যজমি তিনি (সোনাধন) আর পাবেন না, এটা তাদের (বিজিবি) দখল করতে হবে। এটা ১২ বিজিবি ছোট হরিণা জোনের কম্যান্ডিং অফিসারের (সিও) সিদ্ধান্ত। এটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে পরিণতি ভালো হবে না বলেও ক্যাপ্টেন সাদেকী আরফান নিলয় সোনাধন চাকমাকে বলেন।

বরকলে বিজিবি কর্তৃক তিন জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নে স্থানীয় এক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ আবারও জোরপূর্বক হুমকি দিয়ে আদিবাসী তিন জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী তিন জুম্ম গ্রামবাসী হলেন- (১) বিজয় কান্তি চাকমা, পীং-রাঙ্গা চন্দ্র চাকমা, (২) মানেক চাকমা, পীং-রসিক মনি চাকমা ও (৩) বুদ্ধজয় চাকমা, পীং-প্রমোদ চাকমা। তারা সকলেই ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড এর ঠেগাদোর গ্রামের বাসিন্দা।

জানা যায়, গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ ভূষণছড়া ইউনিয়নের ১২ বিজিবি ছোট হরিণা জোনের অধীন ঠেগাদোর বিওপি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক ডেকে পাঠালে স্থানীয় কার্বারি (গ্রাম প্রধান) পুলিন চাকমা, কার্বারি আথোইসি সহ উপরোল্লিখিত তিন গ্রামবাসীও ক্যাম্পে উপস্থিত হন।

এসময় ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক কার্বারি পুলিন চাকমাকে বলেন যে, ওই তিন গ্রামবাসীর ৩ একর পরিমাণ জায়গা তাদের লাগবে। ক্যাম্প কমান্ডার বলেন, 'হাই কমান্ডের নির্দেশ মোতাবেক ওই জায়গায় আমাদের ধান চাষ করতে হবে, সেই ধান জোনে পাঠাতে হবে এবং সেখানে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে। তাই আমাদের এই জায়গা পেতে হবে।'

ক্যাম্প কমান্ডার হুমকি দিয়ে আরও বলেন যে, 'যদি আমাদের অনুরোধে জায়গাগুলো ছেড়ে দেয়া না হয় তাহলে আঙুল বাঁকা করতে হবে।' জানা গেছে, তিন গ্রামবাসীর ঐ ৩ একর পরিমাণ জায়গায় ধান্যজমি, ফলজ বাগান রয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক আইডি কার্ড ও ছবি সংগ্রহেন নামে গ্রামবাসীদের হয়রানি

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন জীবতলী ও মগবান ইউনিয়নের জুম্ম গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ভোটার আইডি কার্ড ও ছবি সংগ্রহের নামে সেনাবাহিনী স্থানীয় জুম্ম গ্রামবাসীদের হয়রানি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, বেশ কিছু দিন ধরে রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নে অবস্থিত গবঘোনা সেনা ক্যাম্প এর সেনা সদস্যরা জীবতলী ইউনিয়ন ও পার্শ্ববর্তী মগবান ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের জুম্মদেরকে তাদের ভোটার আইডি কার্ড ও ছবি এক কপি করে ক্যাম্পে জমা দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে আসছিল।

সেনাবাহিনীর চাপ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মুখে, গত ৭ অক্টোবর ২০২৩ জীবতলী ও মগবান ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ৯ জুম্ম গ্রামবাসী তাদের ভোটার আইডি কার্ড ও ছবি সেনা ক্যাম্পে জমা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানা যায়।

ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা হলেন- ১। দয়াময় চাকমা (৪৫), পীং-পূর্ণজয় চাকমা, জীবতলী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের মেম্বার; ২। উদয় চন্দ্র কার্বারি (৫৭), পীং-শুক্র কুমার চাকমা, জীবতলী ইউডি; ৩। উমেদ কার্বারি (৫৬), পীং-আনন্দ লাল চাকমা, জীবতলী ইউপি; ৪। কিরণময় কার্বারি, পীং-বাক্তা চাকমা, মগবান ইউডি; ৫। কিনাধন কার্বারি (৫৫), পীং-মনোরঞ্জন চাকমা, মগবান ইউডি; ৬। ভিন্ন কার্বারি (৭২), পীং-যুবরাজ চাকমা, মগবান ইউপি; ৭। অক্ষয়মনি কার্বারি (৫৮), পীং-নিশি মোহন চাকমা, জীবতলী ইউপি; ৮। কিরণময় চাকমা, মগবান ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার ও ৯। শিলস কার্বারি (৬৮), পীং-তকুমার চাকমা, মগবান ইউপি।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান ও হয়রানি

রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলাধীন বালুখালী ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর টহল অভিযানের নামে জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর হয়রানি করা হচ্ছে।

গত ৯ অক্টোবর ২০২৩ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের মরিচ্যাবিল সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন মো: আব্দুল্লাহ এর নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনা টহল দল সকাল ১১টার দিকে কাইন্দ্যা পাড়া ব্রীজের দোকানে এসে গ্রামের লোকজনের উপর ২-৩ ঘন্টা নজরদারী করে বসন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়। পরে একই দলের হাবিলদার মো: সোহেল ১২৫ নং মৌজার হেডম্যান সন্তোষ চাকমা, সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার শেফালী চাকমা, দৌজরী পাড়া

গ্রামের কার্বারি মিনতি চাকমা ও মহেন্দ্র লাল কার্বারিকে তলব করে বলে জানা যায়। সেনা সদস্যদের কর্তৃক তাদেরকে হয়রানিমূলক বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় বলে জানা যায়।

অপরদিকে একই দিন সকাল ৯টার দিকে বরকল উপজেলার সুবলং সেনা ক্যাম্প হতে ১৮-২০ জনের একটি সেনা টহল দল বালুখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে ৮-১০ জনের একটি দল পার্শ্ববর্তী কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় টহল অভিযান পরিচালনা করে বলে জানা যায়। পরে কোনো কিছু না পেয়ে বিকাল ৪টার দিকে সেখান থেকে চলে যায়।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক গাছ-বাঁশ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলাধীন বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কুতুবদিয়া গ্রামের কার্বারিকে ডেকে গ্রামের সকলকে পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে গাছ-বাঁশ বিক্রি করা যাবে না বলে সেনাবাহিনীর জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসার নির্দেশ প্রদান করেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, গত ৯ অক্টোবর ২০২৩ সকাল ১০ ঘটিকার সময় সেনাবাহিনীর দীঘলছড়ি জোনের ৩২ বীর এর অধীন গাছকাটাছড়া সেনা ক্যাম্প থেকে একজন সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে ১০-১২ জন সেনাসদস্য বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডস্থ কুতুবদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়।

ওয়ারেন্ট অফিসার এসময় কুতুবদিয়া গ্রামের দুইজন কার্বারি- চানু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৫৪), পিতা- মৃত অনাদি তঞ্চঙ্গ্যা ও বসুনাথ তঞ্চঙ্গ্যা (৫০), পিতা- মৃত তারণী তঞ্চঙ্গ্যাকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে বলেন যে, গ্রামের কেউ গাছ-বাঁশ বিক্রি করলে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। যদি অনুমোদন না নেন তাহলে অসুবিধা আছে বলে হুমকি প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি কুতুবদিয়া গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে ৫টি করে মলি বাঁশ বিনামূল্যে গাছকাটাছড়া ক্যাম্পে দিয়ে আসতে নির্দেশ প্রদান করেন এবং না দিলে সমস্যা হবে বলে হুমকি প্রদান করেন।

রাজস্থলীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ

রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় সেনাবাহিনী কর্তৃক হেডম্যান ও কার্বারীদের নির্দেশ দিয়ে জুম্মদের কাছ থেকে জোরপূর্বক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে রাজস্থলী সেনাবাহিনী স্থানীয় মুরুব্বীদের ক্যাম্পে ডেকে হয়রানিমূলক ভাবে তাদের স্ব স্ব গ্রামের নাম, সম্প্রদায়ের নাম এবং তাদের পরিবারের সংখ্যা লিখে রাজস্থলী সাব জোনে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে দেয়ার হয়।

অভিযোগ রয়েছে যে, ইতিপূর্বেও রাজস্থলী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার কার্বারীদের ডেকে তাদের এলাকার আদিবাসী জুম্ম সম্প্রদায়ের পাড়ার নাম, সম্প্রদায়ের নাম এবং পরিবার সংখ্যা সম্বলিত তথ্য উক্ত সাবজোনে জমা দিতে বাধ্য হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজস্থলী এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, গত ১৭ ও ১৮ অক্টোবর রাজস্থলী আর্মি সাব জোন কর্তৃপক্ষ রাজস্থলী উপজেলার ৩৩৫ নং ধনুছড়ি মৌজা ও ৩৩৩ নং ঘিলাছড়ি মৌজার হেডম্যান কার্বারীদের সাবজোনে ডাকা হয়। উক্ত সেনা কর্তৃপক্ষ হেডম্যান ও কার্বারীদের নিজ নিজ এলাকার গ্রামের নাম, সম্প্রদায়ের নাম এবং পরিবারের সংখ্যা লিখে সাব-জোনে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় বলে জানা যায়।

ভূক্তভোগীরা অভিযোগ করে যে, ইতিমধ্যে ধনুছড়ি মৌজার ৬টি এলাকার কার্বারী এবং ঘিলাছড়ি মৌজার ১৬টি পাড়ার কার্বারীদের পাড়ার নাম, সম্প্রদায়ের নাম ও পরিবার সংখ্যা লিখে সাব-জোনে জমা দিতে বাধ্য হয়েছে ।

লংগদুর বগাচতরে সেনাবাহিনী টহল অভিযান, জুম্ম গ্রামবাসীর কাঠ জব্ধ

গত ২৪ অক্টোবর ২০২৩ ভোর ৬টায় রাঙ্গামাটি জেলার লংগড়দু উপজেলার গুলমাখালীস্থ ৩৭ বিজিবির রাজনগর জোনের এডি মোঃ হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির ৩০/৩৫ জনের একটি দল দুইভাগে বিভক্ত হয়ে বগাচতর ইউনিয়নের অন্তর্গত চিবেরেগা এলাকায় স্থলপথে ২টি জীপ গাড়ি ও জলপথে একটি ইঞ্জিন চালিত বোট নিয়ে নলুয়াছড়ার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে টহল অভিযান পরিচালনা করে। সেখানে পুরো এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে আদিবাসীদের নিজস্ব বাগান থেকে সংগৃহীত জনৈক ব্যবসায়ীর ৬১ লগ গামারী কাঠ ও ৫ লগ সেগুন কাঠ আনুমানিক ১৮০-২০০ ফুট কাঠ জব্দ করে নিয়ে চলে যায়।

লংগদু উপজেলার বিজিবির আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় প্রায় সময় দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা টহল অভিযান পরিচালনা করার কারণে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। নিজেদেরে বসতবাড়ির কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো প্রকার গাছ, বাঁশও সংগ্রহ করতে পারছে না এলাকাবাসী।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক একজন জুম্ম গ্রামবাসীকে ধরপাকড়

গত ২৩ অক্টোবর ২০২৩ ২রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি

উপজেলার সেনাবাহিনীর কর্তৃক জুরাছড়ি উপজেলার তরিন্দ্র চাকমা, পিতা লাল মোহন চাকমা, গ্রাম-লাম্বাবাক, ৩নং ওয়ার্ড, ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়ন নামে একজন জুম্মকে ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে তার বসতঘরটি পুড়ে গেলে আপদকালীন সময়ের জন্য বর্তমানে তার পরিবার নিয়ে তার গ্রামের পার্শ্ববর্তী বিলাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতুলি এলাকার শুকনাছড়িতে বসবাস করছেন বলে জানা যায়।

জানা যায়, গত ২৩ অক্টোবর ২০২৩ বিলাইছড়ি উপজেলার ৩২ বীর দীঘলছড়ি সেনা জোনের অধীন শুক্কোচছড়ি সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে ১৫/১৬ জনের একটি সেনাদল শুকনাছড়ি গ্রামে টহল অভিযানে গেলে সেখানকার নিজ বাড়ি থেকে তরিন্দ্র চাকমাকে ধরে নিয়ে যায়। তরিন্দ্র চাকমাকে সেনাবাহিনী কেন ধরে নিয়ে গেল, কোথায় ও কেমন আছে তাও জানে না পরিবারের লোকজন। পরিবারের লোকজন অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন বলে জানা যায়।

দীঘিনালার সাধনাটিলা বনহিহারে সেনাবাহিনীর টহল

গত ২৭ অক্টোবর ২০২৩ সেনাবাহিনীর একটি দল দুপুর দেড়টার দিকে খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় সাধনাটিলা বনবিহারে ভীতিজনক টহল অভিযান পরিচালনা করার অভিযোগ পাওয়া যায়। সেনারা বিহারে প্রবেশ করে ১০-১৫ মিনিট অবস্থান করে বলে জানা যায়। এরপর সেনা দলটি বিহারের বাইরে গিয়ে বিহারে প্রবেশের রাস্তায় অবস্থান নিয়ে লোকজনের কাছ থেকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং এক গ্রামবাসীকে ভিডিও ধারণ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় সেনা সদস্যরা বিহার এলাকায় ড্রোনও উড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করে। প্রায় আধা ঘন্টার মতো অবস্থান করার পর সেনারা সেখান থেকে চলে যায়।

উল্লেখ্য, সেনাবাহিনী ও সেটলার বাঙালিরা দীর্ঘ সময় ধরে সাধনাটিলা বনবিহারে জায়গাটি বেদখলে নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। সেনাবাহিনীর নিষেধাজ্ঞার কারণে এলাকাবাসী বিহারের উন্নয়মূলক কোন কাজ করতে পারছে না। এমনকি বিহার এলাকায় বসবাসকারী লোকজন পর্যন্ত নিজেদের ঘরবাড়ি নির্মাণ, মেরামত করার জন্যও সেনাবাহিনীর অনুমতি নিতে বাধ্য হচ্ছে।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান, হয়রানি

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার বিলাইছড়ি সদর ইউনিয়ন ও কেংড়াছড়ি ইউনিয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুটি দল টহল হয়নানিমূলক টহল অভিযান পরিচালনা করার খবর পাওয়া যায়। গত ২৮ অক্টোবর ২০২৩ সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে বিলাইছড়ি উপজেলা সদরের ৩২বীর দীঘলছড়ি সেনা জোনের অধীন ধুপশীল সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনাদল টহল অভিযানে বের হয়। সেনা সদস্যরা প্রত্যেকে লোহার টুপি পরিহিত ছিল। পরে তারা ১নং বিলাইছড়ি সদর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের দীঘলছড়ি মোন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে তারা কিছুক্ষণ আশেপাশের জুম্ম বাড়িতে টহল অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা ২/৩ জন জুম্ম নারীর সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং সন্ত্রাসী দেখেছে কিনা, সেখানে সন্ত্রাসী আসে কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে হয়রানি করে।

উক্ত গ্রামে ঘন্টাখানেক অবস্থান করার পর ওই সেনাদলটি বিলাইছড়ি মোন হয়ে ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের পরীখলা মোনের দিকে রওনা দেয়। এসময় সেনা সদস্যরা বিলাইছড়ি মোন হতে তিন জন জুম্ম শ্রমিককে তাদের সাথে থাকা জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। পরে পরীখলা মোনে পৌঁছে ওই শ্রমিকদের জনপ্রতি মাত্র ৬০ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। স্থানীয়দের মতে, এধরনের কাজে একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিক অন্তত ৫০০ টাকা।

অপরদিকে, উক্ত টহল দল অভিযানে বের হওয়ার পরপরই ৩২বীর দীঘলছড়ি সেনা জোন হতে ক্যাপ্টেন আরিফ এর নেতৃত্বে ২০ জনের অপর একটি সেনাদল একেবারে যুদ্ধংদেহী ভঙ্গীতে বিলাইছড়ি ঢেবার মাথা হয়ে হাজাছড়া পাড়া এলাকায় টহল চালায় বলে জানা যায়। ওই এলাকায় কিছুক্ষণ টহল অভিযান চালানোর পর এই সেনাদলটি পরীখলা মোন পাড়ায় যায়। সেখানে বাসনাদেবী চাকমা নামে এক নারীকে তার দোকান থেকে বের হতে বলে এবং সাথে সাথে সেনা সদস্যরা ওই নারীকে বন্দুক তাক করে একটি দেশীয় বন্দুক হাতে গুজে দিয়ে মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু ওই নারী তা করতে অস্বীকার করে।

এরপর সেনা সদস্যরা ওই নারীকে 'এখানে জেএসএস'এর লোক এসেছিল, আমাদেরকে খবর দাওনাই কেন?' ইত্যাদি নানা জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বলে জানা যায়। পরে উভয় সেনাদল একত্রিত হয়ে বেলা ১:৩০ টার দিকে পরীখলা মোন থেকে বাঙালকাবা প্রাথমিক স্কুলের দিকে চলে যায় এবং তারা সেখানে অবস্থান করে বলে জানা যায়।

কাপ্তাইয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস উড়ানোতে বাধা

রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলাধীন ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড এর কুকিমারা গ্রামে বৌদ্ধদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব

প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ফানুস উড়ানোর সময় স্থানীয় বিজিবি কর্তৃক বাধা প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৯ অক্টোবর রাত ৮:৩০ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন ওয়াগ্‌গা ইউনিয়নের কুকিমারা গ্রামের বৌদ্ধদের অন্যতম উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ফানুস উড়ানোর সময় কুকিমারা বিজিবি ক্যাম্প এর ক্যাম্প কমান্ডার রাজ্জাকের অধীনে ৪ থেকে ৫ জন বিজিবি সদস্য বাধা প্রদান করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৌদ্ধদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও কুকিমারা গ্রামের বৌদ্ধরা বিহারে ফানুস উত্তোলন অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এই সময় হঠাৎ কোনো কথাবার্তা ছাড়াই রাত ৮:৩০ টার দিকে কুকিমারা বিজিবি ক্যাম্প হতে ক্যাম্প কমান্ডার রাজ্জাকের নেতৃত্বে ৪/৫ জন বিজিবি সদস্য এসে ফানুসগুলোর উপর লাঠি মারা শুরু করে। এতে এক পর্যায়ে গ্রামের অবস্থানরত যুবকরা এর প্রতিবাদ করতে এলে বিজিবির সদস্যদের সাথে তাদের বাক-বিতন্ডা হয়। বিজিবির সদস্যদের গ্রামবাসীর প্রতি এমন জঘন্য আচরণ করার কারণ জানতে চাওয়া হলে উত্তরে বিজিবি সদস্যরা তাদের বিজিবি ক্যাম্পে ফানুস বাতি পড়ার সম্ভাবনার অজুহাত দেখায়।

গ্রামবাসীরা বলেন, বিজিবি ক্যাম্পে যদি ফানুস বাতি পড়েই থাকে তাহলে গ্রামবাসীদের সাথে সেই বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু পবিত্র ফানুস বাতিতে বিজিবি সদস্য কর্তৃক লাঠি মারার মতো এহেন কাজ তারা আশা করেনি। এটা সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অবমাননা করার মত। এক পর্যায়ে গ্রামের সকল সদস্যদের প্রতিবাদের মুখে ৩০ অক্টোবর গ্রামের মুরব্বিদের সাথে বিজিবি সদস্যদের আলোচনা হবে বলে জানা যায়।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

বিলাইছড়িতে কেএনএফ কর্তৃক ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের হুমকি

রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার ১নং বিলাইছড়ি সদর ইউনিয়নের ৫নং বহলতলি এলাকায় গত ৮ জুলাই ২০২৩ রাত আনুমানিক ৮:৪৫ টার দিকে ওড়াছড়ি ত্রিপুরা গ্রামের কার্বারীকে ফোন করে বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করে এবং সময়মত না দিলে খবর আছে বলে হুমকি দেয়।

জানা যায়, বম পার্টি তথা কেএনএফ-এর লোক পরিচয় দিয়ে ওড়াছড়ি ত্রিপুরা গ্রামের কার্বারিকে মোবাইল ফোনে ওড়াছড়ি গ্রামের পাশে তাদের অবস্থান রয়েছে এবং আগামীকাল (অর্থাৎ ৯ জুলাই ২০২৩) সকালের মধ্যে ১৫ হাজার টাকা তাদেরকে প্রদান করতে হবে বলে এবং না দিলে অসুবিধা হবে বলেও হুমকি দেয় সেই বম পার্টির সমস্য।

নান্যাচরে সেনাবাহিনী ও সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক গুলিবর্ষণ ও তল্লাশি

রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের ভূইয়াদাম গ্রামে হানা দিয়ে সেনাবাহিনী ও সেনা মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) কর্তৃক একজনকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ও আরেক ব্যক্তির বাড়িতে হয়রানিমূলক তল্লাশি চালিয়ে লুটপাট করার খবর পাওয়া যায়।

জানা যায়, গত ১৮ জুলাই বিকাল ৪টার সময় সেনাবাহিনীর রাঙামাটি সদর জোন থেকে কালো রঙের মাইক্রোবাস যোগে একদল সেনা ও লাল রঙের পাজেরো গাড়িতে করে সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী মিল্টন তঞ্চঙ্গ্যার নেতৃত্বে একটি দল ভূইয়াদাম গ্রামে হানা দেয়।

এ সময় স্বপ্না চাকমার দোকানে অবস্থানরত গ্রামের বাসিন্দা রুপেশ চাকমা ওরফে রিক্তবাপ (৩৭), পীং- শান্তি কুমার চাকমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে।

এরপর একই গ্রামের আলো বিকাশ চাকমা (৪৩), পীং- শান্তিপ্রিয় চাকমার বাড়িতে প্রবেশ করে তল্লাশি চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় ও টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

মহালছড়িতে সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক একজন ধরে পুলিশে সোপর্দ

খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক ডেকে নিয়ে অতুল চাকমা, পিতা- সুধীর চন্দ্র চাকমা, গ্রাম- উচ্চ কেঙেলছড়ি, ৯নং ওয়ার্ড মহালছড়ি সদর ইউনিয়ন-কে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার খবর পাওয়া যায়।

জানা যায়, গত ১৯ জুলাই ২০২৩সকাল ৯টার সময় ধৈর্য নামের এক সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী অতুল চাকমাকে ২৪ মাইল নামক স্থানে তাদের সাথে দেখা করতে ডেকে পাঠায়। দুপুর ১২টার দিকে অতুল চাকমা তাদের দেয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা মাত্রই সেখানে থাকা সেনামদদপুষ্ট সন্ত্রাসী এবং চাকমা, সুমন্ত চাকমা (কালামিলে বাপ), প্রকাশ চাকমা (টুকলো) ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী দলের সদস্য টনেল চাকমা অতুল চাকমাকে সেখান থেকে অন্যত্র ডেকে নিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

এরপর পুলিশ তাকে মহালছড়ি থানায় নিয়ে যায় এবং দুপুর ২টার দিকে খাগড়াছড়িতে চালান দেয় বলে জানা যায়।

রুমায় অস্ত্রের মুখে কেএনএফের চাঁদাবাজি

বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নে বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ব্যাপক চাঁদা দাবি করার এবং জোরপূর্বক মুরগী, ছাগল, কুকুর ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ২১ আগস্ট ২০২৩ রাতে কেএনএফ'র একটি সশস্ত্র দল পাইন্দু ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের পরোওয়া পাড়া গ্রামে প্রবেশ করে। প্রবেশ করেই তারা কোনো টাকা না দিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে প্রায় ৩২ কেজি ওজনের মুরগী ছিনিয়ে নেয় এবং ১টি কুকুর গুলি করে মেরে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা পরিবার প্রতি ৫০০ টাকা করে চাঁদা তুলে তাদেরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করার কথা বলে যায়।

এর পরেরদিন ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখও কেএনএফ'র ১২ জনের একটি সশস্ত্র দল পাইন্দু ইউনিয়নের থোয়াইবতং পাড়া গ্রামে প্রবেশ করে। সেখানে তারা এক গ্রামবাসীর একটি ছাগল জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে জবাই করে খেয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া থোয়াইবতং পাড়া গ্রামবাসীদের ৪ বস্তা চাল, চাইন্দা হেডম্যান পাড়া গ্রামবাসীদের ৩ বস্তা চাল এবং মুয়ালপি পাড়া গ্রামবাসীদের ৩ বস্তা চাল ২৪ আগস্টের মধ্যে জোগাড় করে দিতে হবে জানায় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা।

রাঙ্গামাটিতে সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নারীর বাড়ি তল্লাশি ও টাকা লুট

গত ২২ আগস্ট ২০২৩ রাত আনুমানিক ৮:৩০ টার দিকে প্রবেশ চাকমা ও মিল্টন চাকমার নেতৃত্বে সেনা-মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের ১০-১২ জনের একটি দল রাঙ্গামাটি শহরের ভেদভেদি এলাকায় বিফলা চাকমা নামে এক নারীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে বলে জানা যায়।

তল্লাশি করার সময় সন্ত্রাসীরা বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং বিফলা চাকমার গলা থেকে একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া বিফলা চাকমার ছেলের মাটির ব্যাংক ভেঙে জমানো কিছু টাকা-পয়সাও ছিনিয়ে নেয়। যাওয়ার সময় স্বর্ণের চেইন ও মাটির ব্যাংকের টাকা ছিনিয়ে নেয়ার বিষয়টি যেন কোনো অবস্থাতে কেউ জানতে না পারে- সে কথাও বলে যায় সন্ত্রাসীরা। তল্লাশির সময় সন্ত্রাসীরা বিফলা চাকমার স্বামী প্রবীণ চাকমাকেও খোঁজ করে বলে জানা যায়।

রেমাক্রি প্রাংসায় কেএনএফের চাঁদাবাজি

বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলার ৩নং রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের মেনরন ম্রো কার্বারী পাড়ায় বম পার্টি নামে খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের কর্তৃক জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ রুমা উপজেলার ৩নং রেমাক্রি প্রাংসা ইউনিয়নের মেনরন ম্রো কার্বারী পাড়াতে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের ১২ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ প্রবেশ করে। এসময় কেএনএফের সদস্যরা পরিবার প্রতি ৫০০ টাকা করে মোট ২০,০০০ টাকা চাঁদা আদায় করে। উক্ত পাড়ায় মোট ৪০টি পরিবারের বসবাস রয়েছে।

এছাড়াও পাড়ার শিক্ষক কাইনপা ম্রো এবং চংরাও ম্রো-এর কাছ থেকে ৭,৫০০ টাকা করে মোট ১৫,০০০ টাকা এবং ওয়ালিং ম্রো নামে একজন গাছ ব্যবসায়ী থেকে ৭,৫০০ টাকাসহ সর্বমোট ৪২,৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে জানা গেছে। অপরদিকে উক্ত ম্রো পাড়া থেকে ফেরার পথে ২টি চিনা হাঁস বিনামূল্যে নিয়ে যায়, যার বাজার মূল্য ২,০০০ টাকা।

এছাড়াও কেএনএফ সন্ত্রাসীরা একই উপজেলার প্রেনঅং ম্রো পাড়া এবং লেংপু পাড়াতেও যায়। সেখানে গিয়ে আগামী ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিবার প্রতি ১,০০০ টাকা করে চাঁদা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে যায়।

রুমায় কেএনএফ কর্তৃক প্রতি পরিবার থেকে ৫০০ টাকা করে চাঁদাবাজি

প্রতি পরিবার থেকে ৫০০ টাকা করে চাঁদা আদায়ের জন্য বান্দরবানের রুমা উপজেলার পাইন্দু ও সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন মারমা গ্রাম থেকে বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসীরা চড়াও হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু হুমকি উপেক্ষা করে গ্রামবাসীরা চাঁদা প্রদানে বিরত থাকে।

তার প্রেক্ষিতে এসবিবিএল বন্দুকসহ ৬ জনের একদল কেএনএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাগান্বিত হয়ে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাত ৭:৩০ ঘটিকায় দুইটি মারমা পাড়ায় চড়াও হয়। তারা প্রথমে ১নং পাইন্দু ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের নিয়াংক্ষ্যং পাড়ায় ঢুকতে চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে নিয়াংক্ষ্যং গ্রামে ঢুকতে সাহস করেনি বম পার্টির সন্ত্রাসীরা।

এরপর কেএনএফ সন্ত্রাসী ৩নং ওয়ার্ডের পলিতং পাড়ায় হানা দেয়। সেখানে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দুই দিনের মধ্যে ২০,০০০ টাকা চাঁদা দাবি করে। টাকা নিতে দুই দিন পর তারা আবার পলিতং পাড়ায় আসবে বলে হুমকি দিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা।

তারপর কেএনএফ সন্ত্রাসী রাত ৮টার দিকে চাইয়াগ্র পাড়ায় চড়াও হয়। পাড়ায় ঢুকে গ্রামবাসীদের গালিগালাস ও হুমকি দিয়ে হুংকার দিতে থাকে। এ সময় ৪০/৫০ জন গ্রামবাসীরা বাড়ি থেকে বের হয়ে চারদিকে সন্ত্রাসীদের ঘিরে ধরে। একপর্যায়ে গ্রামবাসীদের ভয় দেখানোর জন্য সন্ত্রাসীরা দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে এবং দ্রুত গ্রাম ছেড়ে কেএনএফ সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

রুমায় কেএনএফ কর্তৃক দুই নিরীহ মারমা গ্রামবাসীকে মারধর

বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রুমা উপজেলার রুমা ইউনিয়নের পলিকা পাড়ায় সেনাবাহিনী মদদপুষ্ট বম পার্টি নামে খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের কর্তৃক দুই জন নিরীহ জুম্মকে মারধরের অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ১২ সেপ্টেম্বর আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ টার দিকে তুংখ্যংওয়া পাড়া থেকে বেরিয়ে পলিকা পাড়ার দিকে যাওয়ার পথে উশৈনু মারমার ছেলে মংচসিং মারমা (২২) নামে এক জুম্ম যুবককে মারধর করে কুকি-চিন সন্ত্রাসীরা।

অন্যদিকে আনুমানিক রাত ৯ টার দিকে উক্ত ১২ জনের কুকি-চিন সন্ত্রাসীদের গ্রুপটি পলিকা পাড়াতে এসে পৌঁছালে সাথে সাথে সেখানেও এমংউ (৩০) নামের এক নিরীহ জুম্মকে পেছন থেকে লাথি মারে।

বান্দরবানের টংকাবতীতে চাঁদাবাজির সময় সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীর গণধোলাইয়ের শিকার

বান্দরবান জেলাধীন সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নের ব্রিক-ফিল্ড বাজার এলাকায় জোরপূর্বক চাঁদা তুলতে গিয়ে সেনামদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের দুই সদস্য স্থানীয় জনগণের গণধোলাইয়ের শিকার হয়েছে। গণধোলাই দেয়ার পর স্থানীয় জনগণ নিজেরাই ওই দুই চাঁদাবাজকে বান্দরবানে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকালের দিকে বান্দরবান সদর থেকে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের দুই কর্মী মোটর সাইকেল যোগে টংকাবতী ইউনিয়নের ব্রিক-ফিল্ড বাজারে চাঁদা তুলতে যায়। চাঁদা তোলার এক পর্যায়ে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) এর ওই দুই কর্মী একটি চায়ের দোকানে বসে নাস্তা খাওয়া শুরু করে এবং তাদের একটি পিস্তল টেবিলের একপাশে রাখে। এসময় বাজারে আসা জনগণের কয়েকজন হঠাৎ করে টেবিলে রাখা ঐ পিস্তলটি নিজেদের দখলে নেয় এবং সাথে সাথে আশেপাশের উত্তেজিত জনতা সেখানে এসে ওই দুই চাঁদা সংগ্রহকারীকে গণধোলাই দেয়। ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের ওই দুই কর্মীর মধ্যে একজনের নাম বিকাশ চাকমা এবং অপরজন মারমা সম্প্রদায়ের লোক, তবে তার নাম জানা যায়নি।

মানিকছড়িতে সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক তিন গ্রামবাসীদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশ

খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে সেনাবাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসী কর্তৃক তিন গ্রামবাসীকে এলাকা ছাড়ার জন্য হুমকি দিয়েছে। জানা যায়, গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকালে লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোনের অধীন নয়াবাজার আর্মি ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য ও সেনামদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসীদের একটি দল যৌথভাবে মানিকছড়ি-ফটিকছড়ি সীমান্তের চাইল্যাচর নামক গ্রামে যায়। এ সময় সেনা ও তাদের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা গ্রামের বাসিন্দা মেদু মারমা ও তার দুই ছেলে উচাইরি মারমা এবং কংচাইরি মারমার কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। আগামী ৫ দিনের মধ্যে উক্ত চাঁদা না দিলে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হুমকি দেয়।

রাঙ্গামাটি পৌর এলাকায় সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ইউপি মেম্বারকে অপহরণ

গত ৮ অক্টোবর ২০২৩ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার সমতা ঘাট বাজার হতে সকাল ১০ ঘটিকার সময় অরুণ চাকমার দোকান থেকে রঞ্জন বিকাশ চাকমা (৫০) নামে এক জুম্মকে সেনা মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসী বিপ্লবের নেতৃত্বে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। অপহৃত রঞ্জন বিকাশ চাকমার কাছ থেকে নগদ ৩২,০০০ টাকা এবং মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় অপহরণকারীরা। এছাড়া সন্ত্রাসীরা হুমকি প্রদান করে বলে যে, টাকা এবং মোবাইল এর বিষয়ে কাউকে জানালে প্রাণে বাঁচতে দেবো না। রঞ্জন বিকাশ চাকমা নানিয়ারচর উপজেলার ৩নং বুড়িঘাট ইউনিয়নের শৈলেশ্বরী তালুকদার পাড়ার ধন মোহন চাকমার ছেলে।

এর কিছুক্ষণ পরে সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি সদর জোনে ফোন দিয়ে রঞ্জন বিকাশ চাকমাকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। সেনাবাহিনী রঞ্জন বিকাশ চাকমাকে সদর জোনে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে জানা গেছে। সেনা সদস্যরা ছেড়ে দেয়ার সময় অপহরণকারীরা কোনো কিছু নিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে সন্ত্রাসীদের ভয়ে রঞ্জন বিকাশ অস্বীকার করেন বলে জানা যায়।

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল

বিলাইছড়ি-কাপ্তাই সীমান্তে সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের জলেভাসা জমি জবরদখল

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নে বসবাসকারী বহিরাগত সেটেলার বাঙালিরা পার্শ্ববর্তী কাপ্তাই উপজেলার ৪নং কাপ্তাই ইউনিয়ন এলাকায় ১২ জুম্ম পরিবারের অন্তত ২৪ একর জলেভাসা ধান্য জমি জোরপূর্বক বেদখলের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়। এমনকি সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের তাদের জমিতে চাষের কাজে বাধা দেয় এবং কাজ বন্ধ না করলে রক্তপাত হবে বলেও হুমকি দেয়।

জানা যায়, গত ৩ জুলাই ১৩০ নং বারুদগোলা মৌজার কাপ্তাই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কিল্ল্যাছড়ি ভাবনা কেন্দ্র পাড়া গ্রামের অধিবাসী পুলক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৩৪) পীং-নোয়া মুনি তঞ্চঙ্গ্যা ও একই গ্রামের দয়া মন চাকমা (৬৮) পীং-মৃত কিনাধন চাকমা, তাদের জলেভাসা জমি সংস্কারের জন্য বিশ জন শ্রমিক নিয়ে কাজ করতে যায়। এমন সময় পার্শ্ববর্তী বিলাইছড়ি উপজেলার ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের কেংড়াছড়ি সেটেলার এলাকা হতে বর্তমান ইউপি মেম্বার মোঃ রবিউল, পীং-মৃত রফিকুল এর নেতৃত্বে ৪০/৫০ জন সেটেলার বাঙালি সেখানে গিয়ে পুলক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও দয়া মন চাকমাকে এবং তাদের শ্রমিকদের জমিতে কাজ করতে পারবে না বলে জানায় এবং কাজ বন্ধ না করলে রক্তপাত ও প্রয়োজনে গণহত্যা হবে বলেও হুমকি প্রদান করে।

সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক বেদখলের চেষ্টার শিকার ভুক্তভোগী জমির মালিকরা হলেন- ১. পুলক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৩৪) পিতা-নোয়া মুনি তঞ্চঙ্গ্যা, তার জমির পরিমাণ ১ একর; ২. দয়া মন চাকমা (৬৮) পিতা-মৃত কিনাধন চাকমা, তার জমির পরিমাণ ১ একর; ৩. নিজল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৩৬) পিতা- হনুমান তঞ্চঙ্গ্যা, তার জমির পরিমাণ ১ একর; ৪. অভিমন্যু তঞ্চঙ্গ্যা (৪৮) পিতা-মৃত শুভং তঞ্চঙ্গ্যা, তার জমির পরিমাণ ৩ একর; ৫. রজিন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৩৩) পিতা-মৃত শুভং তঞ্চঙ্গ্যা, তার জমির পরিমাণ ২ একর; ৬. গুনবীর চাকমা (৩১) পিতা-বিমল চাকমা, তার জমির পরিমাণ ২ একর; ৭. ধনঞ্জয় চাকমা (৩৫) পিতা-বিমল চাকমা, তার জমির পরিমাণ ২ একর; ৮. তরুণ জ্যোতি চাকমা (৪১) পিতা-বিমল চাকমা, তার জমির পরিমান ২ একর; ৯. লিটন চাকমা, তার জমির পরিমাণ ১ একর; ১০. রেনু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৪২) পিতা-মৃত হনুমান তঞ্চঙ্গ্যা, তার জমির পরিমাণ ৩ একর; ১১. নয়ন কুমার (২৭) পিতা-অলঙ্গ তঞ্চঙ্গ্যা, তার জমির পরিমাণ ৩ একর; ১২. মেলো তঞ্চঙ্গ্যা (৫৫) স্বামী-অলঙ্গ তঞ্চঙ্গ্যা, তার জমির পরিমাণ ৩ একর। তারা সকলেই কাপ্তাই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কিল্ল্যাছড়ি ভাবনা কেন্দ্র পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

লংগদুতে সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের প্রথাগত ভূমি জবরদখলের পাঁয়তারা

গত ১৭ জুলাই ২০২৩ সকাল আনুমানিক ৯টা থেকে ১২টার মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার ভাসন্যাদম ইউনিয়নে মুসলিম বাঙালি সেটেলারদের কর্তৃক জোরপূর্বক জুম্মদের মালিকানাধীন প্রথাগত ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফলজ গাছ সহ জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভূমি বেদখলের চেষ্টার শিকার ভুক্তভোগী জুম্মরা হলেন- শীলকাটা ছড়া গ্রামের বাসিন্দা ১. অনিল বিকাশ চাকমা (৪৫), পিতা- সুরলাল চাকমা, ২. রত্ন জ্যোতি চাকমা (৩৬), পিতা-জ্ঞানেন্দ্র চাকমা, ৩. অঞ্জন প্রসাদ চাকমা (৪৮), পিতা-হরিশ চন্দ্র চাকমা, ৪. সজীব চাকমা (৪৫), পিতা-রত্ন কুমার চাকমা।

জানা যায়, ঐদিন সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে ৫নং ভাসন্যাদম ইউনিয়নের ১৭নং ঘনমোড় মৌজার অন্তর্গত শীলকাটাছড়া সেটেলার বসতি এলাকার ২০-২২ জনের বাঙালি সেটেলারদের একটি দল শীলকাটাছড়া গ্রামে জুম্মদের মালিকানাধীন প্রথাগত ভূমিতে ফলজ গাছসহ জঙ্গল পরিষ্কার করা শুরু করে। বাঙালি সেটেলারদের কর্তৃক জঙ্গল পরিষ্কার করার ঘটনা জানাজানি হলে ভূমির মালিক জুম্মরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যান এবং তাদের জায়গায় বাঙালি সেটেলারদের জঙ্গল পরিষ্কার করতে নিষেধ করেন। কিন্তু বাঙালি সেটেলাররা জুম্মদের নিষেধ তোয়াক্কা না করে জুম্মদের রোপণকৃত আম, লিচু ও আমলকি গাছসহ কমপক্ষে ২ একর পরিমাণ জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করে চলে যায় এবং উক্ত জায়গাটি শীলকাটাছড়া সেটেলার এলাকার বাসিন্দা মোঃ হোসেন এর জায়গা বলে দাবি করে উল্টো বিভিন্ন হুমকি দিয়ে যায়।

জানা যায় এসময় বাঙালি সেটেলার দলটিকে নেতৃত্ব দেন শীলকাটাছড়া সেটেলার এলাকার বাসিন্দা মোঃ হোসেন (২৯), পিতা-হারুনুর রশীদ, মোঃ সাগর (২৪), পিতা-শরিফুল, মোঃ মনছুর আলি (৪০), পিতা-মৃত মজিদ, মোঃ জলিল (৩২), পিতা-মৃত সালাম, মোঃ ফারুক (৪১), পিতা-মৃত হাসান আলী প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা

গত ১৭ জুলাই ২০২৩ সকালের দিকে খাগড়াছড়ি মাটিরাঙ্গা উপজেলার মাটিরাঙ্গা সদর ইউনিয়নের ওয়াসু মৌজার পূর্ব তৈকুম্ভা পাড়া এলাকায় মুসলিম বাঙালি সেটেলারদের কর্তৃক স্থানীয় জুম্মদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা জায়, ঐদিন সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে পার্শ্ববর্তী সেটেলার এলাকার ৮-১০ জনের মুসলিম বাঙালি সেটেলারদের একটি দল পূর্ব তৈকুম্ভা পাড়া এলাকায় গিয়ে জুম্মদের মালিকানাধীন প্রথাগত জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করা শুরু করে। এক পর্যায়ে ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয় জুম্ম নারী-পুরুষরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং জঙ্গল কাটারত সেটেলারদের জঙ্গল কাটতে বাধা প্রদান করলে বাধার মুখে মুসলিম সেটেলাররা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

মহালছড়িতে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটেলার কর্তৃক ভূমি বেদখলের চেষ্টা

গত ২১ জুলাই ২০২৩ তারিখে মুসলিম সেটেলারদের কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের চেষ্টার সর্ব সাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐদিন বেলা ২টার দিকে লেমুছড়ি এলাকার মোঃ আব্দুল লতিফ, পিতা-কাশেম মন্ডল নামে এক বাঙালি সেটেলার জয়সেন পাড়ায় নতুন নির্মিত সেনা ক্যাম্প থেকে ৩০ জনের একদল সেনা সদস্য নিয়ে পার্শ্ববর্তী জুম্ম অধ্যুষিত বদানালা গ্রামে যায়।

এসময় মোঃ আব্দুল লতিফের পরামর্শে সেনা সদস্যরা জুম্মদের কয়েকটি বাড়ি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেও সেটেলাররা ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকার জুম্মদের উপর হামলা চালায়। এতে কয়েকজন জুম্ম আহত হয় এবং কয়েকটি বাড়ি পুড়ে যায়। পরে পুড়ে যাওয়া ওই বাড়ি জুম্মরা মেরামত করেন।

এদিকে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের বাড়ি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টার কথা জানাজানি হলে, এলাকাবাসী, বিশেষ করে নারীরা ঘটনাস্থলে এগিয়ে আসেন এবং তারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। নারীদের এই প্রতিবাদের মুখে সেনা সদস্যরা তাদের প্রচেষ্টা বন্ধ করেন। এসময় সেনা সদস্যরা নারীদের কাছে 'বাড়িগুলো কখন নির্মাণ করা হয়েছে' জানতে চাইলে, নারীরা 'তারা এখানে বহু বছর ধরে বসবাস করছেন' বলে জানান। এরপর সেনা সদস্যরা আর কিছু না বলে পরে সেখান থেকে চলে যান।

এসময় ঘটনাস্থলে বদানালা গ্রামের কার্বারি অনন্ত বিকাশ চাকমা ও ৪নং মাইসছড়ি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড মেম্বার গুণসিন্ধু চাকমা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির নেতার বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ

বান্দরবানে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মুসলিম সেটেলারদের উগ্র সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি আবুল কালামের বিরুদ্ধে চোরাচালানের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ করেন সাবেক ম্রো ন্যাশনাল পার্টি (এমএনপি)-এর কমান্ডার মেনরুং ম্রো। আবুল কালাম বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের ৫৫ ও ৫৬ নাম্বার সীমান্ত পিলার এলাকা দিয়ে অবৈধ গরু চোরাচালান, অবৈধ বিদেশী সিগারেট ও মদ চোরাচালানে জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ বিকালে আলিকদম উপজেলা সদরের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন এমএনপির সাবেক কমান্ডার মেনরুং ম্রো।

সংবাদ সম্মেলনে ম্রো ন্যাশনাল পার্টির (এমএনপি) সাবেক কমান্ডার মেনরুং ম্রো বলেন, বান্দরবান জেলা নাগরিক পরিষদের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবুল কালাম দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ম্রো ও মারমা শ্রমিক ব্যবহার করে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে অবৈধ বিদেশি গরু, বিদেশী সিগারেট, মদ চোরাচালান করে আসছে। এসবের প্রতিবাদ করার কারণে উপজেলা চেয়ারম্যান কালাম প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন এবং গত ২৮ আগস্ট তাকে মারধর করেছেন মর্মে দাবি করেন মেনরুং ম্রো।

লামায় ৩০ পরিবার রোহিঙ্গা বসতি স্থাপন

প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ

থেমে নেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন ও কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ও যোগসাজসে রোহিঙ্গারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অনুপ্রবেশ ও বসতিস্থাপন করছে। শুধু তাই নয়, তারা জুম্মসহ স্থায়ী বাসিন্দাদের হুমকি দিচ্ছে, হয়রানি করছে, জুম্মদের ভূমি বেদখলে জড়িত হচ্ছে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ করে ভোটার তালিকাভুক্ত হচ্ছে, ইয়বাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য পাচার করে গোটা পার্বত্য এলাকায় নিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নে অন্তত ৩০ পরিবার রোহিঙ্গা লোকজন বসতি গেড়ে বলে খবর পাওয়া গেছে। এসব রোহিঙ্গারা স্থানীয় জুম্মদের মারধরসহ মেরে ফেলার হুমকিও দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি স্থানীয় এলাকাবাসীসহ স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে লামার সরই ইউনিয়নের লুলাইং বাঙালি বাজার এলাকায় বহিরাগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বসতিস্থাপনের সত্যতা পাওয়া গেছে।

জানা যায় যে, কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং ও বালুখালী শরণার্থী ক্যাম্প থেকে এসে অন্তত ৩০ পরিবার রোহিঙ্গা শরণার্থীর লোকজন লামার লুলাইং বাঙালি বাজার এলাকায় বসতি স্থাপন করেছে। এতে লুলাইংসহ আশেপাশের এলাকায় জননিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। রোহিঙ্গারা কথায় কথায় স্থানীয় জুম্মদের বলে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোদের খুন করে পালিয়ে যাবো। আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না। আমাদের পিছুটান নেই।

রোহিঙ্গারা আসার পর থেকে স্থানীয় লোকজন প্রায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে। কারণ তারা খুব অল্প টাকার (৩০০/৩৫০) বিনিময়ে দিনমজুরি করে। দ্রব্যমূল্যের যে উর্ধ্বগতি, এত অল্প টাকায় স্থানীয়রা কাজ করলে জীবিকা চলবে না। শ্রমবাজার এখন প্রায় রোহিঙ্গাদের দখলে।

বান্দরবানে হোটেল থেকে ৩০ জন রোহিঙ্গা আটক

গত ৩১ আগস্ট ২০২৩ বিকেলে বান্দরবান জেলা সদর ট্রাফিক মোড় এলাকায় পর্বত আবাসিক হোটেলে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে ২০ রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে বলে জানা যায়।

আটককৃতরা হলেন- নূর আলম (৫০), জোহর (৩৫), হাফিজুর রহমান (২৮), নূর আলম (৩৭), হোসাইন (২২), ইউসুফ (২১), আরিফ (৩০), হাসান (২০), রুহুল আমিন (২২), সিদ্দিক (২১), আরাফাত (২০), সালাম (২৫), রিফান (১৬), হাকিম (৩০), আলিম উল্লাহ (২৬), আলম (৩০), জাফর হোসেন (২২), হোসেন আহমদ (৩৬), রশিদ উল্লাহ (১৬) ও আহমুদুল (৫২)। তারা সবাই কক্সবাজার উখিয়া থ্যাংখালী ১৩ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এসিওই ব্লকের বাসিন্দা।

জানা যায়, বান্দরবানের ফজল করিম মাঝি নামের এক ব্যক্তি ২০ রোহিঙ্গাকে কাজের কথা বলে পর্বত হোটেলে রাখেন। পরে পুলিশ হোটেল থেকে তাদের আটক করে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ

পার্বত্য চট্টগ্রামে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ও বসতি বন্ধ রাখার জন্য বান্দরবানে রোহিঙ্গ্যা ক্যাম্প স্থাপন না করার সরকারের পূর্বের ঘোষণা লংঘন করে সম্প্রতি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে একটি প্রত্যাবাসন শিবির ও সাময়িক বিশ্রাম শিবির (ট্রানজিট ক্যাম্প) নির্মাণের উদ্যোগ নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানা না গেলেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পূর্ব প্রস্তুতির কথা বলে এইসব শিবির নির্মাণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের (আরআরআরসি) কর্মকর্তারা।

আরআরআরসির দপ্তরের কর্মকর্তারা বলেছেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হলে রাখাইনের মংডু জেলার উত্তর-পশ্চিম এলাকার বাসিন্দাদের ওই পথে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হবে। আগেভাগে প্রস্তুতি হিসেবে দুটি অস্থায়ী শিবির নির্মাণ করে রাখা হচ্ছে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে ওই দুটি শিবির নির্মাণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানান শরণার্থী সেলের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব শামীম রহমান। এই নির্মাণকাজের সবটাই কক্সবাজারের শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশন তদারক করছে বলে জানা যায়।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রোমেন শর্মা এ বিষয়ে বলেন, নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ইউনিয়নে সাময়িক বিশ্রাম ও প্রত্যাবাসন শিবিরের জন্য আরআরআরসি থেকে সাড়ে তিন একর জায়গা চাওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর সময় সাময়িক অবস্থানের জন্য ঘুমধুমে ২০ শতাংশ জমির ওপর সাময়িক বিশ্রাম শিবির করা হবে। সীমান্ত সংলগ্ন তুমব্রুতে ৩ দশমিক ২০ একর জমিতে প্রত্যাবাসন শিবির হবে।

লংগদুতে সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের চেষ্টা

রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার ৭নং লংগদু ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাইবোনছড়া এলাকায় পার্শ্ববর্তী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক দীর্ঘদিন ধরে এক আদিবাসী জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভূমি বেদখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে সেটেলার বাঙালি ও স্থানীয় জুম্মদের মধ্যে বিরোধের এক পর্যায়ে সেটেলার বাঙালিরা গত ১২ অক্টোবর ২০২৩ ভোররাত ২টার দিকে স্থানীয় এক বৌদ্ধ বিহারে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। বিহারের ভিক্ষু প্রাণের ভয়ে পার্শ্ববর্তী এক জুম্ম গ্রামবাসী বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

জানা যায়, লংগদু উপজেলার ৩নং লংগদু মৌজার ভাইবোনছড়া এলাকায় সুনীল কুমার চাকমা, পীং-তরুণী সেন চাকমা এর ৫.০০ একর পরিমাণ ভূমি বন্দোবস্তী রয়েছে। ওই ভূমির হোল্ডিং নং-এইচ ২৬, বন্দোবস্তী মামলা নং-১০৪৭ (ডি)/৭৫-৭৬ইং। কয়েক বছর আগে, ভূমির মালিক সুনীল কুমার চাকমা উক্ত ভূমি থেকে ২.০০ একর ভূমি 'বিবেক সাধনা বন বিহার' এর নামে দান করেন। ফলে অবশিষ্ট থাকে ৩.০০ একর ভূমি। সুনীল কুমার চাকমা ওই ভূমিতে সেগুনসহ বিভিন্ন বনজ গাছ গড়ে তোলেন।

উখিয়ায় সত্তরোর্ধ্ব এক বৌদ্ধ ভিক্ষু হামলার শিকার

গত ৩ জুলাই ২০২৩ কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়া উপজেলার হলদিয়াপালং ইউনিয়নে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক সত্তরোর্ধ বয়সী এক বৌদ্ধ ভিক্ষু হামলার শিকার হয়েছেন। ভুক্তভোগী বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম শ্রীমৎ ধর্মজ্যোতি (৭২)। তিনি স্থানীয় মরিচ্যা শ্রাবস্তি বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ। সেদিন ভোরের দিকে অজ্ঞাতনামা একদল দুর্বৃত্ত বৌদ্ধ বিহারের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং এসময় সেখানে থাকা বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মজ্যোতিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে। এতে গুরুতর আহত বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞান হারান।

এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় শ্রীমৎ ধর্মজ্যোতিকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। দায়িত্বরত কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা আহত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কক্সবাজার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু আহত বৌদ্ধ ভিক্ষুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে আবার কক্সবাজার জেলা হাসপাতাল থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহত বৌদ্ধ ভিক্ষুর মাথায়, হাতে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে জখমের চিহ্ন রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার ব্যাপারে উখিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা যায়নি। উল্লেখ্য, ২০১২ সালেও একদল দুর্বৃত্ত স্থানীয় এক বৌদ্ধ বিহারে হামলা ও লুটপাট চালায়।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

লংগদুতে ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষক জামিনে মুক্ত হয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল

রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার আটরকছড়া ইউনিয়নের আরএস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রহিম (৪৬) একই স্কুলের এক জুম্ম ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী হয়েও সম্প্রতিত আদালত থেকে তিন মাসের জন্য জামিন পেয়ে সরকারি আইনের বিধিমালা লংঘন করে বহাল তবিয়তে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ সকাল ১০টার দিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী বাড়ির ছাগলের খোঁজে বের হন। অনেক খোঁজাখুজির পর না পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে করল্যাছড়ি আরএস উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রহিমের সাথে দেখা হয়। প্রধান শিক্ষক ভুক্তভোগীকে লেবু নিয়ে যেতে বলে স্কুলের দিকে ডেকে নিয়ে যায়। ভুক্তভোগী কাছে গেলে প্রধান শিক্ষক ছাত্রীর হাত ধরে জোর করে স্কুল হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

৫ অক্টোবর ২০২০ স্কুলছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে লংগদু থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় ২০২২ সালের ২৯ নভেম্বর প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রহিমকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন বছরের সশ্রম কারাদন্ডের রায় দেন রাঙ্গামাটির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ ই এম ইসমাইল হোসেন।

সম্প্রতি দন্ডপ্রাপ্ত আসামী মোঃ আব্দুর রহিম ভুক্তভোগীকে দুই মাসের মধ্যে এক একর জমি লিখে দেয়ার শর্তে হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন তিন মাসের জামিন নেন। উল্লেখ্য যে, সরকারি চাকরি আইনের বিধিমালার (১) ধারা অনুযায়ী কোন সরকারি কর্মচারী ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক মৃত্যুদন্ড বা এক বছর মেয়াদের অধিক মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হলে দন্ড আরোপের রায় বা আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে চাকরি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত হবেন। আশ্চর্যজনকভাবে এরকম বিধান থাকা সত্ত্বেও দন্ডপ্রাপ্ত আসামি মোঃ আব্দুর রহিম গত ২৩ জুন ২০২৩ হতে বহাল তবিয়তে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

নাইক্ষ্যংছড়িতে সেটেলার কর্তৃক এক তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরীকে অপহরণ

গত ৩ আগস্ট ২০২৩ রাত আনুমানিক ১০ ঘটিকার সময় বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ৫নং সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের পাইয়াঝিরি তঞ্চঙ্গ্যা গ্রাম থেকে ৩জন সেটলার বাঙালি যুবক কর্তৃক নিলা তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক জুম্ম কিশোরীকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়।

ঘটনার পর অপহরণের শিকার নিলা তঞ্চঙ্গ্যার মা নিলামী তঞ্চঙ্গ্যা (৪১) নিজেই বাদী হয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এজাহার অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন- মোঃ রাসেল (১৮), পিতা-শামসুল আলম, শামসুল আলম (৪৭), পিতা-মৃত জালাল আহম্মদ, তৈয়বা বেগম (৪০), স্বামী শামসুল আলম। সর্ব সাং- শিলঘোনা, ভালুক খাইয়া, ৯নং ওয়ার্ড, ১নং নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউপি।

পরিবারের সূত্রে জানা যায়, গত ৩ আগস্ট ২০২৩ রাত আনুমানিক ১০.০০ ঘটিকায় সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে অভিযুক্ত মোঃ রাসেল (১৮) ও তার ৩ সহযোগী মিলে জোরপূর্বক মোটর সাইকেলে করে ভুক্তভোগী কিশোরীকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে তার পরিবারের লোকজন বাড়িতে এসে দেখে যে তার মেয়ে বাড়িতে নেই। অনেক খোঁজাখুজির পর কোথাও না পেয়ে স্থানীয় মুরুব্বীদের বিষয়টি জানালে তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণের পরামর্শ দেন।

কল্পনা চাকমার অপরহণ মামলায় পুলিশ সুপারের মামলা বন্ধ করার আবেদন, বিবাদীর নামঞ্জুর

গতকাল ১৩ আগস্ট ২০২৩ রাঙ্গামাটিতে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ পুলিশ সুপার কর্তৃক আদালতে প্রদত্ত কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে মামলার বাদী ও কল্পনা চাকমার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমার নারাজি আবেদনের প্রেক্ষিতে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুনানিতে বাদীপক্ষ পুলিশের তদন্তে ত্রুটির অভিযোগ তোলেন এবং অধিকতর তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান। অপরদিকে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার পক্ষ মামলাটি বন্ধ করার আবেদন জানান। আদালতের অতিরিক্ত চীফ

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্ণ কমল সেন শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনলেও এইদিন কোনো আদেশ দেননি। পরে যেকোনো সময় আদালত উক্ত শুনানির আদেশ দিতে পারে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শুনানিতে বাদীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বাদীর আইনজীবী অ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান ও অ্যাডভোকেট রাজীব চাকমা এবং মামলার বাদী ও কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা। অপরদিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদালত পরিদর্শক মোঃ আজম ও পুলিশ উপ-পরিদর্শক গণেশ শীল।

শুনানি চলাকালে পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি আদালত পরিদর্শক মোঃ আজম এবং পুলিশ উপ-পরিদর্শক গনেশ শীল পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনের স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন এবং মামলাটি ক্লোজ করে দেয়ার আবেদন জানান বলে জানা যায়।

মহালছড়িতে সেটেলার কর্তৃক এক মারমা তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২০ আগস্ট ২০২৩ খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ডিপি পাড়া এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা মেয়েকে (১৯) ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষণ চেষ্টায় অভিযুক্ত সেটেলার বাঙালির নাম মোঃ সোহেল (৩১), পিতা- মোঃ কবির আহম্মদ, গ্রাম- নুনছড়ি গুচ্ছগ্রাম ১নং ওয়ার্ড, মাইসছড়ি ইউনিয়ন।

জানা যায়, ঐদিন রাত ৮টার সময় ভুক্তভোগী মেয়েটি বাড়িতে একা থাকার সুযোগে মো. সোহেল মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে মেয়েটির চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে গেলে ততক্ষণে মোটর সাইকেলযোগে ধর্ষণ চেষ্টাকারী মো. সোহেল পালিয়ে যায়। তবে মেয়েটির বর্ণনা অনুযায়ী এলাকার লোকজন ধর্ষণ চেষ্টাকারী মো. সোহেলকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়।

পরে রাত ১১টার সময় ভুক্তভোগী মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে মহালছড়ি থানায় মামলা দায়ের করা হলে পরদিন সোমবার (২১ আগস্ট) সকালে পুলিশ অভিযুক্ত মো. সোহেলকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।

লংগদুতে ধর্ষক প্রধান শিক্ষককে শিক্ষকতা থেকে অপসারণ ও যাবজ্জীবন সাজা বহালের দাবি

গত ২৪ আগস্ট ২০২৩ বৃহস্পতিবার রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার করল্যাছড়ি রশিদ সরকার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও লংগদুর সর্বস্তরের জনগণের উদ্যোগে ধর্ষক প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিমকে স্কুল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার ও যাবজ্জীবন সাজা বহালের দাবিতে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

লংগদু সদরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। দেড় ঘন্টাব্যাপী চলা উক্ত মানববন্ধনে স্কুল শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে লংগদু উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ১৫০০ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ৭ নং লংগদু ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান বিক্রম চাকমা (বলি), করল্যাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা এরিক চাকমা, করল্যাছড়ি রশিদ সরকার উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী কল্যাণ প্রিয় চাকমা, উক্ত বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র লিটু চাকমা।

অপরদিকে গত ২৮ আগস্ট ২০২৩ সকাল ১১টা ঘটিকায় নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত ধর্ষক আব্দুর রহিমকে করল্যাছড়ি রশিদ সরকার (আরএস) উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককের পদ হতে স্থায়ী বহিষ্কার ও যাবজ্জীবন সাজা বহালের দাবিতে রাঙ্গামাটির ডিসি অফিসের গেইট প্রাঙ্গণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে অমরজ্যোতি চাকমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ।

ঢাকার উত্তরায় এক চীনা নাগরিক কর্তৃক একজন জুম্ম নারী ধর্ষিত

ঢাকার উত্তরায় চীনে নিয়ে গিয়ে বিয়ের করার প্রলোভন দেখিয়ে এক চীনা নাগরিক কর্তৃক একজন জুম্ম নারীর সহযোগিতায় এক জুম্ম কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ২৫ আগস্ট ২০২৩ রাতে চীনের নাগরিক জি সেনের বাসায় উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরে নিয়ে যান হীরা চাকমা। তারপর কলেজছাত্রীকে চীনের নাগরিক জি সেনের রুমে নিয়ে যায় হীরা চাকমা। একপর্যায়ে কলেজছাত্রীর অনিচ্ছা সত্তেও জোরপূর্বকভাবে কলেজছাত্রীর জামা-কাপড় খুলে দেয় জি সেনের সহযোগী হীরা চাকমা। তারপর কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ করেন জি সেন। তারপর দিন ছাত্রী বাসা থেকে চলে যেতে চাইলে জি সেনের সঙ্গে বিয়ের কথা বলে ফাঁদে ফেলা হয় তাকে। পরদিন একই কথা বলে আবারও ধর্ষণ করা হয় তাকে।

জুম্ম কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে উক্ত চীনা নাগরিক জি সেন (৫৮) ও তার সহযোগী হীরা চাকমা (২৫) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কাপ্তাইয়ে সেনাবাহিনী সদস্য কর্তৃক একজন মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ

রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাদা পোশাক পরিহিত ৫/৬ সদস্য কর্তৃক ১৬ বছরের এক মারমা কিশোরী গণ-ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল আনুমানিক ৯:০০ টার দিকে কাপ্তাই সেনা জোনের ৫৬ বেঙ্গলের অধীন রাইখালীর মিতিঙ্গাছড়ি সেনা ক্যাম্পের সাদা পোষাক পরিহিত ৬ সদস্য রাইখালী ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মিতিঙ্গাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা এসএসসি পরীক্ষার্থী এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে।

ঘটনার পর উল্টো ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষ গণধর্ষণের শিকার কিশোরীর পরিবার ও গ্রামের কার্বারীকে ক্যাম্পে ডেকে কাউকে না জানাতে নির্দেশ দেয় এবং প্রকাশ করলে ভুক্তভোগী পরিবারের চরম পরিণতি মুখোমুখী হবে বলে হুমকি প্রদান করে। এমনকি হুমকির মুখে ভুক্তভোগী কিশোরী থেকে ভিডিও জবাববন্দী নিয়ে 'ঘটনাটি অসত্য' বলে প্রচার করা হয়।

রামগড়ে সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম গৃহবধুকে ধর্ষণের চেষ্টা

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের পাগলা পাড়া এলাকায় গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাতে সেটেলার মো. রহমত উল্লাহ (৪৫) কর্তৃক একজন জুম্ম গৃহবধুকে (১৮) ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়। পরে অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে জানা যায়।

জানা যায়, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকাল ৫টার সময় মো. রহমত উল্লাহ পাগলা পাড়ায় মো. আল আমিন-এর চা দোকানে ভুক্তভোগী নারীর স্বামীকে ঔষধ মিশ্রিত চা খাওয়ায়। এর আধা ঘন্টার মধ্যে ভূক্তভোগীর স্বামী বাগানের খামার বাড়িতে যাওয়ার পর অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরে রাত ১২টার দিকে মো. রহমত উল্লাহ বাগানের খামার বাড়িতে গিয়ে ওই নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় ধস্তাধস্তি করে কোন রকমে ওই নারী সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে রাত ২টার দিকে চেতনা ফিরে আসলে তার স্বামী ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পারেন।

উক্ত ঘটনায় গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে ভুক্তভোগী নারী ও তার স্বামী রামগড় থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। মামলার পর পরই পরদিন ৫ সেপ্টেম্বর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ভোরে পিলাভাঙ্গা এলাকা থেকে আসামি রহমত উল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম ছাত্রীকে যৌন হয়রানি

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা পৌরসভার অন্তর্গত বাবু পাড়ায় মাটিরাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক জুম্ম স্কুলছাত্রীকে সেটেলার কর্তৃক যৌন হয়রানির চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়। যৌন হয়রানি চেষ্টাকারী মো: নিজাম উদ্দিন (৩৬), মাটিরাঙ্গা সদরের ২ নং ওয়ার্ডের নবীনগরের মো. গেদু মিয়ার ছেলে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত ২ অক্টোবর সকাল ৯ টার সময় ভুক্তভোগী স্কুলছাত্রী প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সময় পথে মো. নিজাম উদ্দিন ওই ছাত্রীটিকে হাত ধরে টান দিলে মেয়েটি চিৎকার করে উঠে। এতে ওই ছাত্রীর চিৎকার এবং হাত ধরে টানাটানির দৃশ্যটি এক টমটম চালক দেখতে পেলে সাথে সাথে আশেপাশের লোকজনকে জানায়। এরপর লোকজন ছুটে গিয়ে নিজাম উদ্দিনকে ধরে ফেলে এবং গণধোলাই দিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে।

পরে স্থানীয়রা প্রশাসনকে খবর দিলে মাটিরাঙ্গা থানা পুলিশ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ডেজী চক্রবর্তী এসে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন এবং অভিযুক্তকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

লংগদুতে এক সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার গুলশাখালী ইউনিয়নে মো: মাসুম (২৫), পীং- মো: রফিজ উদ্দিন নামের এক মুসলিম সেটেলার কর্তৃক নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক জুম্ম স্কুল ছাত্রী (১৫) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ধর্ষণের চেষ্টাকারী মো: মাসুমের বাড়ি লংগদুর গুলশাখালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত রহমতপুর নামক সেটেলার এলাকায় বলে জানা গেছে।

গত ২৫ অক্টোবর ২০২৩ দুপুর আনুমানিক ১২:৩০টার দিকে মো: মাসুম নামের ওই সেটেলার গুলাশাখালী ইউনিয়নের জুম্ম

অধ্যুষিত রাঙ্গীপাড়া গ্রামে গরুর ঘাস কাটতে যায়। সেখান থেকে ফেরার সময় পানি খেতে এক জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে প্রবেশ করে। এই সময় সেই বাড়িতে একা থাকা নবম শ্রেণির ছাত্রীকে পেয়ে মো: মাসুম যৌন হয়রানিমূলক ও অশালীন কথাবার্তা বলতে শুরু করে। এক পর্যায়ে মো: মাসুম শিক্ষার্থীর গালে ও বুকে হাত দিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এতে ওই শিক্ষার্থী চিৎকার করলে পাশের বাড়িতে থাকা এক কিশোর দৌঁড়ে এসে তাকে সহযোগিতা করে এবং মানুষ ডাকতে থাকলে ধর্ষণের চেষ্টাকারী সেটেলার বাঙালিটি দ্রুত পালিয়ে যায়।

মানিকছড়িতে তিনজন সেটেলার কর্তৃক এক জুম্ম নারীকে গণধর্ষণ

গত ২৫ অক্টোবর ২০২৩ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার গচ্ছাবিল এলাকা থেকে চকিবিল এলাকায় আসার পথে তিন মুসলিম সেটেলার কর্তৃক ফ্যাক্টরীতে কর্মজীবী একজন জুম্ম নারী গণধর্ষণের শিকার হয়। এতে ভুক্তভোগী নারীর পিতা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন (সংশোধন ২০২০) এর ৯ (১)/৩০ মামলার নং- ১৪/২৩ মানিকছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

জানা যায় যে, সেদিন ধর্ষষের শিকার নারীটি ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাস যোগে বাসা থেকে রওনা দেন এবং দুপুর অনুমানিক ১:০০ ঘটিকার সময় মহামুনি বাসস্ট্যান্ডে নেমে মহামুনি হতে মানিকছড়ি বাজারে গিয়ে বাসার জন্য বাজার করে ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক যোগে গচ্ছাবিল বাজারে নেমে অনুমানিক ২:০০ ঘটিকার সময় গচ্ছাবিল হতে বাসার উদ্দেশে পায়ে হেটে রওনা দেন। পথিমধ্যে মানিকছড়ি উপজেলাধীন মানিকছড়ি ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের গচ্ছাবিল পূর্বপাড়া সাকিনস্থ ভান্ডারী দোকানের ৫০০ গজ পূর্বে বেলাল মোড়লের বাগানের সামনে পৌঁছলে উক্ত নারী রাস্তার পাশে অজ্ঞাতনামা ০৩ (তিন) জন ব্যক্তিকে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান। অনুমানিক ০২:১৫ ঘটিকার সময় অজ্ঞাতনামা প্যান্টপরা ০১ (এক) জন সেটেলার মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে টেনে বেলাল মোড়লের বাগানের ভিতর নিয়ে যায় এবং অজ্ঞাতনামা অপর প্যান্টপরা ১ জন ও লুঙ্গিপরা ১ জন মোট ২ জন বিবাদী মেয়েটির হাত এবং পা চেপে ধরে মাটিতে ফেলে এবং প্যান্টপরা ও আমার মেয়ের মুখ চেপে ধরা সেটেলাররা মেয়েটির পরনের পায়জামা খুলে জোরপূর্বক গণধর্ষণ করে।

রবিবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে পুলিশ সুপার মুক্তাধর এক প্রেসব্রিফিং-এর মাধ্যমে ৩ জন গণধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

> ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে এই সংবিধান তাদের কি কাজে লাগবে।’
>
> *—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

সংগঠন সংবাদ

বাঘাইছড়িতে জেএসএস প্রত্যাগত সদস্যদের পুনর্বাসন ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি

গত ১ জুলাই ২০২৩ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি বাঘাইছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্যদের যথাযথ পুনর্বাসন, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিরাপত্তার দাবিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় উক্ত দাবিতে প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাবেক প্রত্যাগত সদস্য সুমতি রঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি উপজেলার ২৮৮ জন প্রত্যাগত সদস্য অংশগ্রহণ করেন বলে সংশিষ্ট সূত্রের মাধ্যমে জানা যায়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির পরপরই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অস্ত্র জমাদানের পর স্ব স্ব এলাকায় স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করলেও এখনো সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি আমাদের মেলেনি। ন্যূনতম যে আশা-ভরসা নিয়ে আমরা একসময় সরকারের কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছিলাম সেই আশা শুধুমাত্র আশা হয়েই থেকে গেলো।

বরকলে পিসিপির বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্ম জনগণের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভূমি ও ভূখন্ডের ওপর অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গত ১০ জুলাই সকাল ১০ টায় বরকল উপজেলা সদরে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজ অধিকতর সামিল হউন' এই আহ্বানকে সামনে রেখে পিসিপি'র বরকল থানা শাখার এই ২১তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপির বরকল থানা শাখার সভাপতি কেতন চাকমার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক প্রিয় জ্যোতি চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য ও বরকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বিধান চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরকল উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শ্যাম রতন চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরা, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির বরকল থানা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক ইলেন চাকমা, বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পিসিপির বরকল থানা শাখার অর্থ সম্পাদক সুরেন চাকমা এবং সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন পিসিপির বরকল থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সবিনয় চাকমা।

রাঙ্গামাটিতে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

গত ১৯ জুলাই ২০২৩ সকাল ১০ টায় রাঙ্গামাটির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেনস ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সুমন চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

অরুণ ত্রিপুরা,পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থোয়াক্য জাই চাক, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার বলেন, যে দেশে বীরের সম্মান থাকে না সেই দেশে বীর জন্মগ্রহণ করে না। উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ তথা দেশের গর্ব হয়ে উঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

ঢাকায় চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে ছাত্র ও যুব সমাবেশ

গত ২৫ জুলাই ২০২৩ ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল দেশের প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহের উদ্যোগে আয়োজিত সংহতি সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জনগণের বিশ্বাসের সাথে প্রতারণা করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।

পার্বত্য চুক্তি দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের দাবিতে বিকাল ৩ টায় ঢাকার শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনে সামিল প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহ' এর ব্যানারে এই সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আদিবাসী ও বাঙালি বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহ মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থলে যোগদান করেন এবং সমাবেশ শেষে একটি বিশাল মিছিল বের করে শাহবাগ কাটাবন প্রদক্ষিণ করে টিএসসিতে এসে শেষ হয়।

উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ যুব মৈত্রীর সভাপতি তৌহিদুর রহমান তৌহিদ এবং সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এর সভাপতি দীপক শীল।

আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাসের গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৩ আগস্ট ২০২৩ আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস এর উদ্যোগে আসন্ন ৯ আগস্ট ২০২৩ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে "বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্য ও আদিবাসী অধিকার" শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে আয়োজন করা হয়।

উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আন্তরিকতায় শান্তি

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যে চুক্তি হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করা গেলে নিশ্চয়ই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকা আরো বড় সংঘাতের দিকে গেলে তা দেশের জন্য সুখকর হবে না, তা শুভ লক্ষণ নয়।

আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস এর আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বাদশা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ রাশেদ খান মেনন এমপি ও বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আ র ম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী এমপি। এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন আ ক ম ফজলুল হক এমপি, অ্যারোমা দত্ত এমপি, লেখক ও সাংবাদিক আবু সাইদ খান, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, ইউএনডিপি-র সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি প্রসেনজিৎ চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি আরও বলেন, '৮০-র দশকে জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে যে সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য এলাকায় পুনর্বাসন করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যটা ভালো ছিল না, কাজটা ভালো ছিল না। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেখানে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। কাজেই এখন দেখতে হবে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা যেন অধিকার বঞ্চিত না হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও এএলআরডির উদ্যোগে ঢাকায় সেমিনার আয়োজিত

গত ৮ আগস্ট, ২০২৩ রাজধানী ঢাকার সিরডাপে আয়োজিত 'আদিবাসীদের ভূমি ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুব শক্তির ভূমিকা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব' শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে এএলআরডি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামসহ অধিকারভিত্তিক ২৩টি সংস্থা এ সেমিনারের আয়োজন করে।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে আদিবাসী তরুণদেরনীতি আদর্শের ভিত্তিতে ভূমি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

এএলআরডি-র চেয়ারপারসন ও নিজেরা করি-র সমন্বয়কারী খুশী কবিরের সভাপতিত্বে সেমিনারে পৃথক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন কর্মী ফাল্গুনী ত্রিপুরা এবং লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, বাংলাদেশ একটি শ্রেণি বিভক্ত, বৈষম্য ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাহলে প্রথমে বুঝতে হবে আদিবাসী যুবকদের বাস্তবতা কী, কার দ্বারা এই সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, শোষণ নিপীড়ন কোথা থেকে হচ্ছে। তিনি বলেন, আত্মপক্ষ ও প্রতিপক্ষ কে-তা আগে নির্ধারণ করতে হবে এবং নিজেদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আদিবাসীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বুঝে নীতি ও আদর্শিক দিক বিবেচনা করে আগাতে হবে। ১৪ টি জাতিগোষ্ঠী আন্দোলন করে সরকারের সাথে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমেই আদিবাসীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কথা থাকলেও দুঃখজনক হলো ২৫ বছরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। তিনি এ বিষয়ে তরুণদের নীতি আদর্শের ভিত্তিতে লড়াই সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

গত ১৯ আগস্ট ২০২৩ 'এসো বুনোফুলেরা, হাতে হাত মিলিয়ে শেকড়ের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নবদিগন্তের গান গায়' শ্লোগানকে সামনে রেখে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ইউনিয়নের উদ্যোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী রিয়া রোয়াজা ও ৩য় বর্ষের ছাত্র মং খিং অংয়ের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি সাগর ত্রিপুরা। দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন ৩য় বর্ষের ছাত্রী রুমিতা চাকমা এবং ২য় বর্ষের ছাত্র ক্যহিং রাখাইন কেইন। প্রধান অতিথি হিসেবে সংরক্ষিত নারী আসন-১১ সাংসদ অ্যারোমা দত্ত (এমপি) উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও বিশেষ কাজের কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মাসুদ, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শাওলী মাহবুব এবং সিনিয়র শিক্ষার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি রিপন জ্যোতি চাকমা, সাবেক সহ-সভাপতি সুইপ্রু মারমা।

ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এনেজল চাকমা স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিনি আদিবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে নবীনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপমা চাকমা ও জুয়েল তঞ্চঙ্গ্যা এবং বিদায়ী ১২তম ব্যাচের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন লুম্বিনী তালুকদার ও কৌশিক মৃ ডন।

রাঙ্গামাটিতে পিসিপি-এইচডব্লিউএফের বিভিন্ন দাবিতে মানববন্ধন

গত ২২ আগস্ট ২০২৩, সকাল ১০ ঘটিকায় কলেজ ফটকে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট, পরিবহন, হোস্টেল ও নানা সমস্যা নিরসনের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডব্লিউএফ)-এর রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে সাধারণ সম্পাদক সুনীতি বিকাশ চাকমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী, পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের নেতৃবৃন্দ। মানববন্ধনে স্বাগত বক্তব্যে এইচডব্লিউএফ রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সহসভাপতি কবিতা চাকমা দ্রুত মহিলা হোস্টেল নির্মাণ শেষ করে চালুর দাবি জানান।

বাঘাইছড়িতে পিসিপির উদ্যোগে ছাত্র ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২৫ আগস্ট ২০২৩ সকাল ১০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার উগলছড়ি মুখ (বটতলা) মাঠে পার্বত্য

চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) বাঘাইছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে এক বিশাল ছাত্র ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকুরিতে ৫% ভাগ আদিবাসী কোটা নিশ্চিতকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট নিরসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়নের দাবি নিয়ে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চিবরন চাকমার সঞ্চালনায় এবং পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি পিয়েল চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ডা: সুমতি রঞ্জন চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি জিকো চাকমা, কাচালং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভদ্রসেন চাকমা, তুলাবান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জ্ঞান রঞ্জন চাকমা, ৩১ নং খেদারমারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিল্টু চাকমা, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের পক্ষে মধুসূদন চাকমা, সুশীল সমাজের পক্ষে বক্তব্য রাখেন শান্তনা চাকমা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক উদ্দীপন চাকমা।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত

ঢাকা:

দিবসটি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০২৩ উদযাপন জাতীয় কমিটি-র উদ্যোগে গত ৮ আগস্ট ২০২৩ সকাল ১০:৩০ টায় ঢাকাস্থ সিরডাপের এটিএম শামসুল হক মিলনায়তনে 'আদিবাসীদের ভূমি ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুব শক্তির ভূমিকা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং সভাপতিত্ব করেন মানবাধিকার কর্মী ও এএলআরডি-র চেয়ারপারসন খুশী কবির। সেমিনারে পৃথক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ এবং উন্নয়ন কর্মী ফাল্গুনী ত্রিপুরা। এতে প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেজবাহ কামাল, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক

রোবায়েত ফেরদৌস, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবিন্দ্রনাথ সরেন, ব্লাস্টের আইন উপদেষ্টা এস এম রেজাউল করিম, আদিবাসী নেত্রী সারা মারান্ডি, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ মুন্ডা, আদিবাসী নারী নেত্রী মেনথেইন প্রমিলা, আদিবাসী যুব ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক টনি চিরান, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা।

চট্টগ্রাম:

৯ আগস্ট ২০২৩, দুপুর ২ টায় চট্টগ্রামের চেরাগি পাহাড়ে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদারকরণে আদিবাসী তারুণ্যের অঙ্গীকার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি। দুপুর ২ টায় শুরু হওয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত।

এতে সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, চট্টগ্রাম এর সভাপতি প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, প্রমা'র সভাপতি ও আবৃত্তি শিল্পী রাশেদ হাসান, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, চট্টগ্রাম এর সাধারণ সম্পাদক শরীফ চৌহান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক মহিউদ্দিন মাহিম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক বসুমিত্র চাকমা।

দুপুর ৩টায় চট্টগ্রামের থিয়েটার ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সদস্য মথি বিকাশ ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আলা উদ্দিন। এছাড়া সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদীচী, চট্টগ্রাম জেলা সংসদের সভাপতি ও সাংবাদিক জসীম চৌধুরী সবুজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, চট্টগ্রাম এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এর সভাপতি তাপস হোড়, কবি ও সাংবাদিক কামরুল হাসান বাদল, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী সুমী খান, রোটারি ক্লাব অব চিটাগং সেন্ট্রাল এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মীর নাজমুল আহসান রবিন ও ঐক্য ন্যাপ, চট্টগ্রাম এর যুগ্ম সম্পাদক পাহাড়ী ভট্টাচার্য। একই স্থানে বিকাল ৫ টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রঁদেভূ শিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম:

দিবসটি উপলক্ষে ৯ আগস্ট ২০২৩, সকাল ৯:৩০ টায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার

উদ্যোগে রাঙ্গামাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং উদ্বোধনী সভা শেষে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৯৯নং পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা (অব: উপ-সচিব)। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী সভা শেষে সকাল ১১:৩০ টায় পৌরসভা প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু করা হয় এবং তা রাজবাড়ির জেলা শিল্পকলা একাডেমিকে এসে সমাপ্ত হয়।

একই দিন সকাল ৯ টায় বান্দরবান জেলা সদরের অরুণ সারকি টাউন হলে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সম্মিলিত আদিবাসী ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় র‍্যালি, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও আলোচনা সভা। এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলা সদরেও বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে র‍্যালি, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চবিতে পিসিপির উদ্যোগে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ 'জুম পাহাড়ের আহ্বান, গাও নবীন মুক্তির গান' স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপির) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা ২০২৩' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের নবীন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বরণ এবং ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সকালের পর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হওয়া আদিবাসী নবীন শিক্ষার্থীদের পরিচয় ও অনুভূতি প্রকাশ এবং ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন বিভাগের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ও স্মৃতিচারণ পর্ব সম্পন্ন হয়। এই পর্বে সঞ্চালনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পহেলা চাকমা ও ফুংপ্রে ম্রো।

মূল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা। এছাড়াও সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বসুমিত্র চাকমা, ফার্মেসী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক উমে ছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রভাষক শাংথুই প্রু, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিপন ত্রিপুরা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগ্রামী সভাপতি নরেশ চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য সুখী কুমার তঞ্চঙ্গ্যা।

ঢাবিতে পিসিপির উদ্যোগে নবীনবরণ

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি অডিটোরিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে 'জুম তরুণের শেকড়ের প্রাণ, চেতনার আকুতিতে দাও শাণ' আহ্বান নিয়ে ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক, নার্সিং-এ ভর্তি হওয়া ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ সেশনের আদিবাসী

শিক্ষার্থীদের উক্ত নবীণবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় ২৯৯ নং পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সাবেক সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেছেন, তরুণদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে, সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে।

পিসিপি'র ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি রেং ইয়ং ম্রোর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৯৯ নং পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সাবেক সাংসদ ও জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম। এতে আরও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. মিহির লাল সাহা, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. ঈষাণী চক্রবর্তী, পালি ও বুড্ডিস্ট স্টাডিস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জ্যোতিষী চাকমা এবং পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম লিটারেচার ও কালচারাল সোসাইটির সদস্যদের মাধ্যমে জাতীয় সংগীত ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দলীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

রাঙ্গামাটিতে ৮৪তম জন্মবার্ষিকীতে এম এন লারমাকে স্মরণ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাঙ্গামাটিতে জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত ও সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৮৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার বলেছেন, পার্বত্য চুক্তি বৈধ চুক্তি, এই চুক্তি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চুক্তি। এই চুক্তি একদিন না একদিন আমরা বাস্তবায়ন করে ছাড়বো। এটা আমরা ছেড়ে দেবো না।

সকাল ১০ টায় রাঙ্গামাটির জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ঊষাতন তালুকদার এসব কথা বলেন।

জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটির জেলা কমিটির সভাপতি ডা: গঙ্গা মানিক চাকমার সভাপতিত্বে এবং সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য

জুয়েল চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিশির চাকমা, সিএইসটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সভাপতি অ্যাডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্যামা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক, হিল উইমেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আশিকা চাকমা।

ঢাকায় এম এন লারমার ৮৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকায় মেহনতি ও গণমানুষের নেতা তথা জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিপ্লবী মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এমএন লারমা)-এর ৮৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'লারমা তোমার জীবনাদর্শ, চিরভাস্বর হয়ে প্রেরণা ছড়াক তারুণ্যের চেতনায়' শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরাম, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে ঢাকার বাংলামটরের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বিকাল ৩:৩০ টায় এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

আলোচনা সভায় সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরীন, লেখক ও সাংবাদিক নজরুল কবীর, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ সিং, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি এবং পরিবেশ বার্তার সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ উজ্জ্বল, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি অতুলন দাস, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রিয়া চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা প্রমুখ। এছাড়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সভাপতি অনন্ত বিকাশ ধামাই। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চ্যং ইয়ং মো।

চট্টগ্রামে এম এন লারমার ৮৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত বিপ্লবী মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৮৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রামে পাথরঘাটাস্থ এম এন লারমা ভাস্কর্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন, মোমবাতি প্রজ্বালন ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপির চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক উখিংসাই মারমার সঞ্চালনায় উক্ত শাখার সহ-সভাপতি বকুল চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হ্লামিও মারমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অম্লান চাকমা প্রমুখ।

চট্টগ্রামে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ চট্টগ্রামের হোটেল সৈকত মিলনায়তনে 'আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন' এ স্লোগান নিয়ে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৮৪তম জন্মবার্ষিকী, বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি অমর কৃষ্ণ চাকমার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জগৎজ্যোতি চাকমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় উদ্বোধক হিসেবে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক শরীফ চৌহান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য ন্যাপ চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সীতাকুণ্ড উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুকর্না চাকমা প্রমুখ।

শিক্ষা দিবসে ঢাকায় পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের বিভিন্ন দাবিতে সমাবেশ

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর ঢাকা মহানগর শাখা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ)-এর ঢাকা মহানগর কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা দিবস উপলক্ষে দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% শিক্ষা কোটা চালু করা সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত ও দক্ষ

শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর শাখার সহ-সভাপতি শুভ চাকমা। ছাত্র সমাবেশে সংহতি জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি দীপক শীল, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অলিক মৃ, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান নীরব, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মৌসুমী চাকমা ও বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক অং শোয়ে সিং মারমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মংক্যজাই চাক।

শিক্ষা দিবসে চট্টগ্রামে পিসিপির কর্মসূচি গ্রহণ

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকাল ৩:৩০ ঘটিকায় দেশের সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% শিক্ষা কোটা চালু করা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম

চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রামে আন্দরকিল্লা মোড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে ছাত্র সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র সমাবেশে পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার অম্লান চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত শাখার সহ-সভাপতি বিনিময় চাকমা সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক নরেশ চাকমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ সভাপতি ডিসান তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সুদীপ্ত চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হ্লামিও মারমা, পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অন্বেষ চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক উখিংসাই মারমা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক সুকর্ণা চাকমা।

রাঙ্গামাটিতে এম এন লারমার জন্মবার্ষিকীকে এইচডব্লিউএফের কবিতা পাঠের আসর

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ১০ ঘটিকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটির জেলা শিল্পকলা একাডেমির অডিটোরিয়ামে বিপ্লবী মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক শিশির চাকমা এবং বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক উ উইন মং জলি। এছাড়াও সাবেক সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার, প্রয়াত লারমার বড় বোন জ্যোতিপ্রভা লারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিভিন্ন কমিটির নেতৃবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা।

কবিতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। কবিতা পাঠ পর্বে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার কবিতা ছাড়াও বাংলা ভাষার দ্রোহমূলক কবিতা পাঠ করা হয়। কবিতা পাঠ করেন অতিথি কবি বিজ্ঞান্তর চাকমা, শুদ্ধোধন তঞ্চঙ্গ্যা, অর্জুন চৌধুরী, আলোময় চাকমা, সানুচিং মারমা, সুকেশ খীসা, যশোধা ত্রিপুরা, উজাই মারমা, সুজন চাকমা, সুশীলা চাকমা, বর্ষামনি চাকমা, সাবিত্রি ত্রিপুরা, পিরুমনি চাকমা, কেয়া চাকমা, রিতু চাকমা, সুবর্ণা তঞ্চঙ্গ্যা, জীবক চাকমা, প্রত্যাশা চাকমা, নিতি ভূবন চাকমা ও রেনু চাকমা।

সিলেটে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকাল ৩ টায় সিলেট শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন'-এর উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সিলেটে সংহতি সমাবেশ ও গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে সেখান থেকে একটি গণমিছিল বের করা হয়।

সিলেটের সংহতি সমাবেশে উপস্থিত থেকে সংহতি বক্তব্য প্রদান করেন বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বাসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নির্বাহী সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শাহীন রহমান, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় পলিট ব্যুরো সদস্য কামরুল আহসান প্রমুখ।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল বলেন, যখন ভালোমানুষ চুপ করে থাকে, তখন দুর্বৃত্তদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না। চুক্তিটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাহাড়ের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা সবাই জানি কাদের হাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি নিয়ে খুব কম কথা বলা হয়, এটা শুধু আদিবাসীদের সমস্যা নয়। যারা সকলের চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে গড়ে ওঠা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন'-এর আয়োজনে এটি হবে পঞ্চম বিভাগীয় সমাবেশ। এর পূর্বে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর ও ময়মনসিংহে সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছিল।

ঢাকায় আদিবাসী যুব ফোরামের যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত

'হে তরুণ প্রাণ, তীর ধনুকে দাও শান, মুক্তির মিছিলে তুলি দ্রোহের স্লোগান' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের উদ্যোগে আদিবাসী যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সভাপতি অনন্ত বিকাশ ধামাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) এবং সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মনজুরুল আহসান খান। জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শুরু হয়। আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র মাদল বাজিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক মনজুরুল আহসান খান।

এসময় তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম আদিবাসীরা সংগঠিত করেছিল। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আদিবাসীরা বাংলাদেশের গৌরব, অহংকার। তারা বাংলাদেশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বাংলাদেশের আদিবাসীদের এখনো সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হলে এই আদিবাসীদেরকে সাথে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, লড়াই-সংগ্রাম করতে গেলে নীতি-আদর্শগত অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধ হতে

হবে। অন্যথায় ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই পরিচালনা করা কঠিনতর হবে। আমাদের দেশে উপনিবেশবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী, আমলা-পুজিবাদ বিরোধী, সম্প্রসারণবাদ বিরোধী নানা বক্তব্য-বিবৃতি দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত লড়াই-সংগ্রাম সেভাবে দেখা যায় না। সেভাবেই আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অধিকতর লড়াই-সংগ্রাম জোরদার করতে হলে নীতি-আদর্শগত প্রশ্নটি সবার সামনে চলে আসে।

শ্রী লারমা আরো বলেন, 'আদিবাসী যুব সমাজের মধ্যে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হলে উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং নীতি-আদর্শগত সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবিষয়ে আদিবাসী যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। পাহাড় কিংবা সমতলে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে প্রগতিশীল নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রস্তুতি নিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা করতে হবে। শুধু সভা-সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে সহভাগী হতে হবে। এভাবেই সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে।'

চবিতে পিসিপির উদ্যোগে মংচসিং স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজিত

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আয়োজিত 'শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩' বিশ্ববিদ্যালয়স্থ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে শুরু হয়।

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এবছরও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে 'শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩' আয়োজন করা হয়।

টুর্নামেন্টটি উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা। উদ্বোধনী পর্বের শুরুতে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

গত ৬ অক্টোবর ২০২৩ এই টুনার্মেন্ট-এর সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রামী সহ-সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি প্রত্যয় নাফাক, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি বিনিময় চাকমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি সঞ্জয় ত্রিপুরা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক চিংমং মারমা প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নরেশ চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সদস্য সুমন চাকমা।

ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের মতবিনিময় সভা

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ১০টায় ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার ও করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন' এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন এর যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন এর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম চৌধুরী।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, ঐক্য ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ তারেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশ জাসদ এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুকসেদুর রহমান লাভু এবং জাসদ প্রতিনিধি ও জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা প্রমুখ।

বক্তব্যে রাশেদ খান মেনন বলেন, আমার মনে হচ্ছে সেকানকার রাজনৈতিক অস্থিরতার দোহাই দিয়ে সেখানে এখন উল্টো সামরিকায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সামরিক সমাধান নেই, রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে।

বরকলে পিসিপির ছাত্র-জনতা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর বরকল থানা শাখার উদ্যোগে দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% শিক্ষা কোটা চালু করা সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে বরকল উপজেলা মাঠে এক ছাত্র ও জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

পিসিপির বরকল থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সবিনয় চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বরকল থানা শাখার সভাপতি মিন্টু চাকমা।

ছাত্র ও জনসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বিধান চাকমা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরকল উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শ্যামরতন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্য জাই চাক, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক টিকেল চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির বরকল থানা শাখার সহ-সভাপতি ইলেন চাকমা।

ঢাকায় পিসিপির ৩০তম কাউন্সিল ও বার্ষিক শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৭ অক্টোবর ২০২৩, সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির মুনীর চৌধুরী মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার ৩০তম কাউন্সিল ও বার্ষিক শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমার সঞ্চালনায় ও সংগঠনের সভাপতি রেং ইয়ং ম্রো'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। এছাড়া বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চ্যুং ইয়ুং ম্রো ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর শাখার সভানেত্রী চন্দ্রিকা চাকমা। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, ঢাকা মহানগরের সহ সভাপতি সতেজ চাকমা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জুম্ম আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিহত শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী হিসেবে পড়াশোনার পাশাপাশি আপনাদেরকে অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে সামিল হতে হবে। শুধু পড়াশোনা করলেন আর নিস্তেজ পড়ে থাকলে হবে না। তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এই অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন সফল করতে প্রয়োজন অস্ত্র। আর সেই অস্ত্র হচ্ছে সুসংগঠিত সংগঠন। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদই পাহাড়ের জুম্ম শিক্ষার্থীদের কাছে শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই আপনাদের সবাই পিসিপিতে যুক্ত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পরা অত্যন্ত জরুরি। আমার অস্তিত্বের জন্য যদি আমিই রক্ত, জীবন দিতে না পারি, তাহলে এই শিক্ষার গুরুত্ব কোথায়? চুক্তি বাস্তবায়ন হবে কিনা, অধিকার আদায় হবে কিনা সেটা নির্ভর করবে প্রতিবাদ সংগ্রাম ভরা সেই রক্ত আপনার আছে কিনা এবং আপনি তা বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত কিনা।

চট্টগ্রামে পিসিপি খুলশী থানা শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১৩ অক্টোবর বিকাল ৩ ঘটিকায় চট্টগ্রাম আর্বান সেন্টারে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে প্রথম খুলশী থানা শাখার সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অম্লান চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সহ-সভাপতি বিনিময় চাকমা।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা শরৎ জ্যোতি চাকমা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নরেশ চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হ্লামিও মারমা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক উখিংসাই মারমা।

লংগদুতে পিসিপির ছাত্র ও যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২২ অক্টোবর ২০২৩ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় সময় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের লংগদু থানা শাখার উদ্যোগে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র ও যুব সমাজ অধিকতর সামিল হউন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে লংগদু উপজেলার বগাচতর এলাকায় এক ছাত্র ও যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সাধারণ সম্পাদক রিন্তুমনি চাকমার সঞ্চালনায় ও সভাপতি রিকেন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি লংগদু থানা কমিটির ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক বিনয় প্রসাদ কার্বারি, পিসিপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি লংগদু থানা কমিটির সভাপতি দয়াল কান্তি চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক টিকেল চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক রনেল চাকমা, ও ৯নং মারিচ্যাচর মৌজার মহিলা কার্বারী নতুনা চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি লংগদু থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সাধন জীবন চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লংগদু থানার ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক বিনয় প্রসাদ কার্বারী বলেন, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কেউই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিপুত্রদের আপন করে নিতে পারেনি। যার কারণে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও জুম্ম জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুব সমাজ যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অধ্যয়ন না করে রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হয় তবে অচিরেই জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ধ্বংস হবে। সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করতে হবে এবং তার জন্য জুম্ম ছাত্র ও সমাজকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে বলে আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

ত্রিপুরায় সিএইচপির উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৯ জুলাই ২০২৩ ক্যাম্পেইন ফর হিউম্যানিটি প্রটেকশন (সিএইচপি)-এর উদ্যোগে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ধলাই জেলার গন্ডাতুইছা মহকুমায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি দ্বাদশ শেণি বিদ্যালয়ে গন্ডাতুইছা ও রস্যাবাড়ীর জনজাতির সামাজিক নেতৃবৃন্দের নিয়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি, ত্রিপুরা রাজ্যে এর প্রভাব ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সিএইচপির সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নিরঞ্জন চাকমা এবং অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাতুইছা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খগেন্দ্র ত্রিপুরা ও বিশিষ্ট লেখিকা ক্রাইরী মগ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সরল মোহন ত্রিপুরা, পুমাং গন্ডাতুইছা; বিজয় কুমার রিয়াং, প্রেসিডেন্ট, বিএসসিও, গন্ডাতুইছা; রামজয় ত্রিপুরা, প্রেসিডেন্ট, ত্রিপুরা চুবুলাই বুথু, গন্ডাতুইছা; বৈকুণ্ঠ চাকমা, সুলোআনি কার্বারী, গন্ডাতুইছা; গোপাল চাকমা, সুলোআনি কার্বারী, কাঞ্চনপুর ও পরিতোষ চাকমা, সুলোআনি কার্বারী, লংতরাই ভ্যালী। আলোচনা সভায় স্বাগত ভাষণ রাখেন দরবাচা চাকমা, প্রতিবেদন পাঠ করেন কালারাম চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন সিএইচপির সাধারণ সম্পাদক শান্তি বিকাশ চাকমা।

বক্তারা ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার লাভের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজাতিদের উপর চলে আসা বহমান নিপীড়ন, অত্যাচার, ধর্ষণ, খুন, ভূমিদখল, ধর্মান্তরকরণ সহ বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ের উপর আলোচনা করেন।

পার্বত্যাঞ্চলে সামরিকায়ন ও প্রচন্ড দমন চলছে জেনেভায় এমআরজি'র অভিমত

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় চলমান জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট ম্যাকানিজম (এমরিপ) এর অধিবেশনে মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল (এমআরজিআই) প্রতিনিধি জেনিফার ক্যাসেলো (Jennifer Castello) বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী তাদের স্বতন্ত্র আদিবাসী পরিচিতি, ভূমি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবি করে আসছেন, কিন্তু একের পর এক সরকারসমূহ তা করতে

ব্যর্থ হয়েছে। তার পরিবর্তে তারা সামরিকায়ন ও প্রচন্ড দমনের সম্মুখীন হয়েছেন, যা এক ব্যাপক সামরিক সংঘাতের সৃষ্টি করেছে।

গত ১৭ জুলাই ২০২৩, জেনেভায় বিকেলের দিকে অনুষ্ঠিত এমরিপের ১৬শ অধিবেশনে এজেন্ডা আইটেম ৩: আদিবাসী অধিকারের উপর সামরিকায়নের প্রভাব সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও উপদেশ-এর উপর বিবৃতি উপস্থাপন করতে গিয়ে এমআরজি প্রতিনিধি এসব কথা বলেন। এমআরজি প্রতিনিধি জেনিফার ক্যাসেলো আরও বলেন, বেসামরিকীকরণ এবং আদিবাসী প্রথাগত ভূমি অধিকারের

স্বীকৃতি বিষয়ে ১৯৯৭ সালে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অথচ ২৫ বছর পেরিয়ে গেলেও সরকার উভয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে এবং আদিবাসীদের অস্বীকৃতি ও প্রান্তিকীকরণের আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করছে।

এমআরজি প্রতিনিধি বলেন, সামরিক বাহিনী সেনা তৎপরতা থেকে অব্যাহতি না নিয়ে, দেশের জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ অধ্যুষিত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন দেশের এক তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনী অবস্থান করছে। সামরিক বাহিনী আগ্রাসীভাবে অর্থনীতি ও ভূমিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে, এবং অনির্বাচিত বেসামরিক সরকার সরাসরি তাদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় রয়েছে। আদিবাসীরা জোরপূর্বক উচ্ছেদের শিকার হয়, কেবলমাত্র ৪০০ সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য নয়, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অনৈতিক বাণিজ্যিক বিনিয়োগ এবং বাঙালি নাগরিকদের বসতি প্রদানের জন্য। এসব কিছু করা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আদিবাসীদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির অধিকারকে লংঘন করে, ক্রমবর্ধমানভাবে জোরপূর্বক নিজেদের পূর্বপুরুষের ভূমি থেকে হাজার হাজার আদিবাসীর বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসন ঘটিয়ে এবং ব্যাপক প্রাণ-পরিবেশগত ও আদিবাসী জ্ঞানের ক্ষতি ঘটিয়ে বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধনের নিয়ে পরিচালিত করে।

জেনিফার ক্যাসেলো আরও বলেন, এই পরিস্থিতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অধিকারকর্মীদের জোরপূর্বক অন্তর্ধান, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনসহ এক ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মানবাধিকার সুরক্ষাকারীরা যারা সাহসের সাথে অবিচারকে প্রতিরোধ করেছে তারা সামরিক বাহিনীর হাতে সহিংসতার শিকার হয়েছে। আদিবাসী নারীদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, যৌন আক্রমণ, ধর্ষণ ও অন্যান্য ধরনের যৌন সহিংসতার অনেকগুলিই সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

তিনি বলেন, আদিবাসী ও তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাসমূহ তুলে ধরতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং স্বাধীন তদন্ত ও জবাবদিহির উন্নয়নে মানবাধিকার সুরক্ষাকারী ও সংগঠনগুলোকে প্রবেশাধিকার প্রদান করা বাংলাদেশ সরকারের জন্য অত্যাবশ্যক।

জেনেভায় জাতিসংঘের এমরিপের অধিবেশনে জেএসএস প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় গত ১৭-২১ জুলাই ২০২৩ তারিখে জাতিসংঘের আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট ম্যাকানিজম (এমরিপ)-এর ১৬তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রীতিবিন্দু চাকমা ও অগাষ্টিনা চাকমা।

১৭ জুলাই ২০২৩ বিকেলের অনুষ্ঠিত এমরিপের অধিবেশনের ১ম দিনের সভায় এজেন্ডা আইটেম ৩: আদিবাসীদের অধিকারের উপর সামরিকায়নের প্রভাব সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও উপদেশ-এর উপর বিবৃতি উপস্থাপন করেন জেএসএস প্রতিনিধি অগাষ্টিনা চাকমা। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অতিরিক্ত সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা হয়ে রয়েছে।

জেএসএস প্রতিনিধি আরও বলেন, সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিরাপত্তার ব্যাপারগুলো ছাড়িয়ে গেছে। তারা আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন ও কল্যাণকে খর্ব করে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন কর্মসূচির অভ্যন্তরেও প্রবেশ করেছে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কার্যকর বাস্তবায়নকে দমন করছে, যে চুক্তিতে তাদের ন্যায্য দুঃখ-দুর্দশাগুলো তুলে ধরার অভিপ্রায় ছিল।

১৮ জুলাই ২০২৩ সকালের দিকে অনুষ্ঠিত এমরিপের অধিবেশনের ২য় দিনের সভায় এজেন্ডা আইটেম ৫: উন্নয়নের অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট মেকানিজমের সাথে পারস্পরিক সংলোপের উপর বিবৃতি উপস্থাপন করেন জেএসএস প্রতিনিধি প্রীতিবিন্দু চাকমা।

প্রীতি বিন্দু চাকমা বলেছেন, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আদিবাসীদের নিজস্ব উন্নয়ন নির্ধারণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু চুক্তির ধারা লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের আওতায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে। ফলে পাহাড়ের অধিবাসীরা আত্ম-নিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৮ জুলাই ২০২৩ অনুষ্ঠিত এমরিপের অধিবেশনের ৩য় দিনের সভায় এজেন্ডা আইটেম ৫: উন্নয়নের অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট মেকানিজমের সাথে পারস্পরিক সংলাপের উপর বিবৃতি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের আদিবাসীদের বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের প্রতিনিধি মিথুন কুমার উঁরাও।

মিথুন কুমার উরাও বলেছেন, বাংলাদেশে পরিবেশগত অবনতি ঘটিয়ে ব্যাপক অনুপযোগী ও শোষণমূলক 'উন্নয়ন' এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন, জীবিকা হারানো, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র ও অস্বাস্থ্য ডেকে এনে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহকে ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যগত ভূমি থেকে বাস্তুচ্যুতির সম্মুখীন করা হচ্ছে। তিনি তার বক্তব্য উপস্থাপনের সময় সমতল ভূমির আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবির কথাও তুলে ধরেন।

১৯ জুলাই ২০২৩, জেনেভায় অনুষ্ঠিত এমরিপের অধিবেশনের ৩য় দিনের সভায় এজেন্ডা আইটেম ১০: পূর্বেকার সমীক্ষা ও উপদেশ-এর উপর আন্তঃঅধিবেশন কার্যক্রমের উপর বিবৃতি উপস্থাপন করেন জেএসএস প্রতিনিধি অগাস্টিনা চাকমা। অগাস্টিনা চাকমা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ ভগ্ন প্রতিশ্রুতি ও সরকারের প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

১৯ জুলাই ২০২৩ অনুষ্ঠিত এমরিপের অধিবেশনের ৩য় দিনের সভায় এজেন্ডা আইটেম ৬: কান্ট্রি ইনগেইজমেন্ট এর উপর বিবৃতি উপস্থাপন করেন জেএসএস প্রতিনিধি প্রীতি বিন্দু চাকমা। শ্রী চাকমা বলেন, একটি নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে এক্সপার্ট মেকানিজ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা তদন্ত করতে পারে এবং এখনও কী কী অবাস্তবায়িত রয়েছে তা চিহ্নিত করতে পারে এবং অবশিষ্ট বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সরকারকে কারিগরী সহযোগিতা জোগান দিতে পারে।

২০ জুলাই ২০২৩ অনুষ্ঠিত এমরিপের অধিবেশনের ৪র্থ দিনের সভায় এজেন্ডা আইটেম ৯: ইন্টারএ্যাকটিভ ডায়ালগ ইউএনপিএফআইআই, দ্যা স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর অন দ্যা রাইটস অব ইন্ডিজেনাস পিপলস, এন্ড ডি ইউএন ভলান্টারি ফান্ড ফর ইন্ডিজেনাস পিপলস (পাবলিক) এর উপর বিবৃতি উপস্থাপন করেন কাপেং ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি মনজুনি চাকমা। মনজুনি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ও সমতলে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিবাসীদের মালিকানাধীন ভূমি বেদখল করা হচ্ছে। স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ব্যতিরেকে তাদের প্রথাগত ভূমির অধিকার লংঘন করে তাদের বসতভিটা ও পূর্বপুরুষের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

২০ জুলাই ২০২৩ অনুষ্ঠিত এমরিপের অধিবেশনের ৪র্থ দিনের সভায় এজেন্ডা আইটেম ১৩: প্রপোজালস টু বি সাবমিটেড টু দ্যা হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল ফর ইটস কনসিডারেশন এন্ড এপ্রোভাল (ওপেন) এর উপর বিবৃতি উপস্থাপন করেন জেএসএস প্রতিনিধি অগাস্টিনা চাকমা। মিজ চাকমা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের উপর অব্যাহতভাবে অপরিসীম ভোগান্তি সৃষ্টিকারী সামরিকায়ন ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাসমূহ তুলে ধরতে ৬টি জরুরি পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছেন।

কলকাতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

'পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ বন্ধ কর'- শ্লোগানকে সামনে রেখে ক্যাম্পেইন অ্যাগেনস্ট অ্যাট্রোসিটিস অন মাইনরিটি ইন বাংলাদেশ (ক্যাম্ব) ও অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের যৌথ উদ্যোগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত 'মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন' বিষয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার ফাইন আর্টস

একাডেমিতে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন ক্যাম্ব-এর ড. মোহিত রায় এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্টের জয়েন্ট কনভেনার সুজিত শিকদার।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখনে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের সাবেক রাজ্যপাল তথাগত রায়, বার্ক-এর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. বিষ্ণু বসু, সিএইচটি পিস ক্যাম্পেইন গ্রুপের করুণালংকার ভিক্ষু প্রমুখ। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল কমিটির সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম কুমার চক্রবর্তী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের সাবেক রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেন, 'আপনারা আপনাদের সংগ্রাম করুন। এই সংগ্রামে কিন্তু ভারতকে সামিল হতে হলে পশ্চিম বাংলায় এ সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত করতে হবে।'

ক্যাম্ব-এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের অন্যতম সমন্বয়ক ড. মোহিত রায় বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ভারতে উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও বাংলাদেশের নিপীড়িত হিন্দু, বৌদ্ধদের পক্ষে রয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা আজ ধ্বংসের মুখে। ভারত থেকে আমাদের সামান্য সমর্থনও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

> '...সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।'
>
> *– **মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা,** (২৫ অক্টোবর ১৯৭২ সংবিধান বিলের উপর আলোচনা)*

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org